কাশ্মীরী স্মাই

আনিস সিদ্দিকী

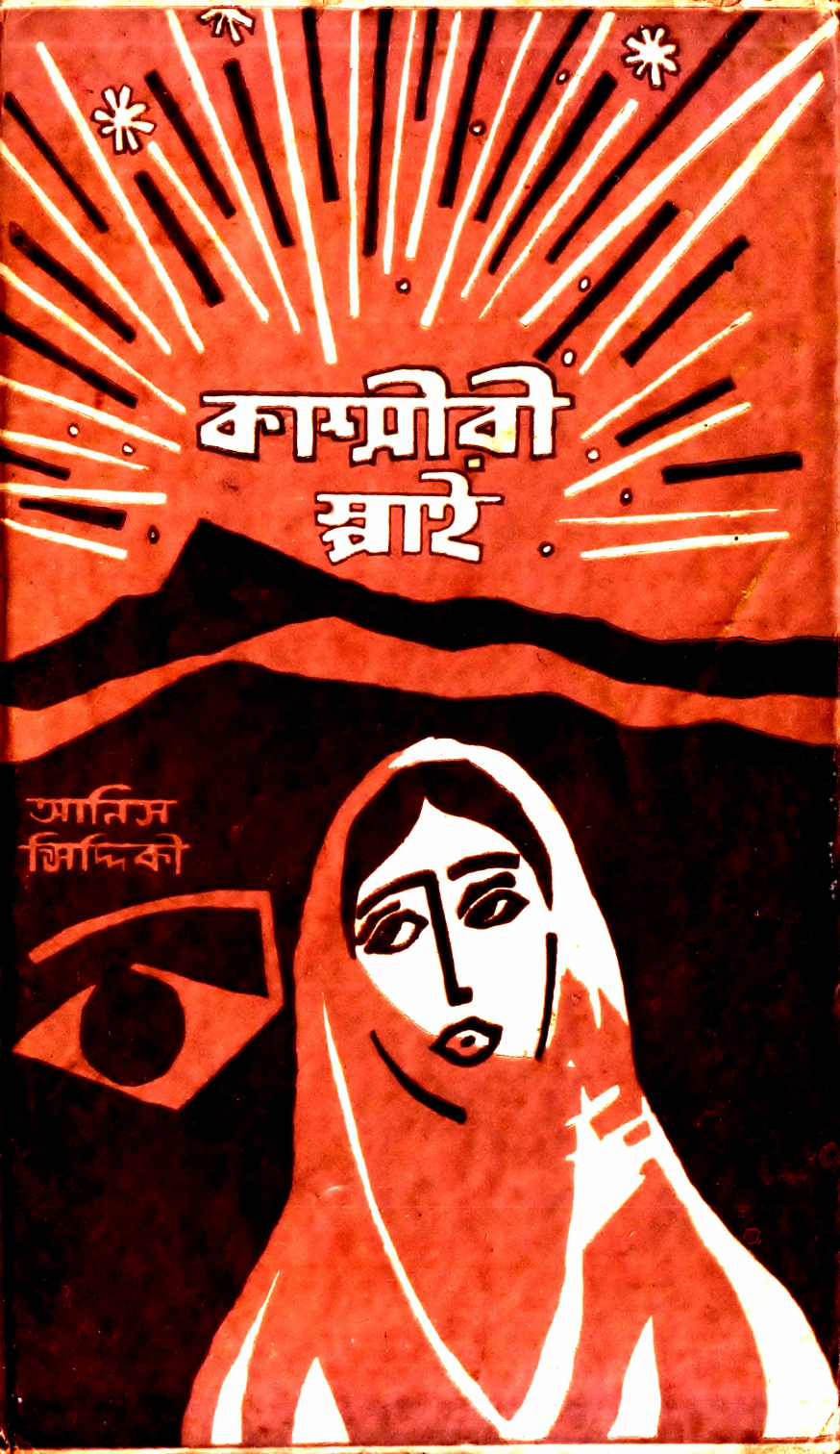

কাশ্মীরী সাই

আনিস সিদ্দিকী

পরিবেশক :

পুরবী পাবলিশার্স

৬৫, প্যারীদাস রোড, ঢাকা

Kashmiree Spy
by
Anis Siddiqui
Price : Tk. 9·00

প্রকাশক : শিল্পী
বসিরউদ্দীন রোড
কলাবাগান, ঢাকা।
প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর—১৯৬৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : জুন—১৯৭৪

প্রচ্ছদ শিল্পী : কাইয়ুম চৌধুরী
মুদ্রাকর : আব্দুল কুদ্দুস সাদী
টাইম প্রেস
১৫/১, হাটখোলা রোড, ঢাকা—৩

দাম : নয় টাকা।

মুহম্মদ আবদুল ওয়াহাব

বন্ধুবরেষু

কৈফিয়ৎ

১৯৬৫ সালে ঐতিহাসিক সেপ্টেম্বর সংঘর্ষের পরে পাকিস্তানের এক সামরিক ছাউনীতে সাক্ষাৎকার ঘটে ভারতীয় কাশ্মীর থেকে আগত এক ভদ্র মহিলার সাথে। তিনি নিজেকে সামরিক হাসপাতালের প্রাক্তন ডাক্তার বলে পরিচিত করেন। বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্বলিত যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী বিবৃত করতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় তিনি যে রোমাঞ্চকর কাহিনী বিবৃত করেন তা অবিশ্বাস্য হলেও ছিল চমকপ্রদ। তাই ধরে রাখার চেষ্টা চলে নোট বইতে কালির আখরে।

পরবর্তীকালে সে কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে 'কাশ্মীরী স্পাই'।

কাশ্মীরের ভারতীয় অংশে সংঘটিত অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র ক'রে এবং পরবর্তী পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিকায় 'কাশ্মীরী স্পাই' রচিত হলেও কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয় এ গ্রন্থ। এটাকে নিছক একটা রোমাঞ্চকর-গল্প কাহিনী হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আনিস সিদ্দিকী

৫ । ১০ । ৬৯

'শুভেচ্ছা'
১৪ এ/৬ সলিমুল্লাহ্ সরক
মুহম্মদপুর, ঢাকা—৭

এই লেখকের ঃ

যখন আমি রানী ছিলাম

বিতাড়িত রাজা ফারুক

সংগ্রামী সুকর্ন

যমুনার তীরে তীরে

মন না মতি

হতভাগ্য বাদশা আমানুল্লা

মুক্তি সংগ্রামের নায়ের

মোগল হেরেমের অন্তরালে

হেরেমের নায়িকা

অবনমিতা

বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে

লুকোচুরি

অদৃশ্য ট্যাবলেট

হেরেম থেকে দূরে

।। এক ।।

মাসুদের রকম সকম দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। মনে হয়েছিল, সে মানসিক আড়ষ্টতা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না। মেজর জেনারেল করণ সিংহও তার লম্বা গোঁফের মধ্যে হেসেছিলেন।

কিন্তু মাসুদ সম্বন্ধে আমার সে ধারণা ও করণ সিংহের বিশ্বাস যে কতো বড় ভ্রান্ত ছিল তা ভাবলে এখনও আমার গা শিউরে ওঠে।

অবশ্য সেদিন মাসুদকে ভুল করেছিলাম বলেই আমি তাঁকে ভালো-বাসতে পেরেছিলাম। তাঁকে পাবার জন্য, তাঁর প্রদত্ত কর্তব্য প্রতিপালনের জন্য অতো একাগ্র ও দুর্বিনীত হতে পেরেছিলাম। আমার মতো ভীত মেয়েও যে-ভয়ঙ্কর সাহসী হতে পারে, জীবনের মায়া পরিত্যাগ ক'রে আগুন নিয়ে খেলতে পারে তা আমি নিজে স্পাইগিরি না করলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

ব্যাপারটা খুলেই বলি: একদিন মেজর জেনারেল করণ সিং এসেছেন মিলিটারী হাসপাতালের চিকিৎসাধীন আহত রোগীদের খোঁজ খবর নিতে। কয়েকদিন আগে শ্রীনগর থেকে একটা পুরো কনভয় যাচ্ছিল পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর সীমান্তের নতুন ঘাঁটিতে। একটা পুল পার হবার সময় অকস্মাৎ গুপ্ত মাইন বিদীর্ণ হওয়ায় সেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে উল্লসিত বীর সিপাইদের আর্ত চীৎকারে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল! অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছিল অকুস্থলে। আগুন লেগেছিল বারুদ ভর্তি দুটো ট্রাকে। এক অভাবনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে। অগণিত আহত সৈনিককে প্রেরণ করা হয়েছিল আমাদের হাসপাতালে। আমিই ছিলাম সেই সামরিক হাসপাতালের একমাত্র পাশকরা ডাক্তার। কয়েকজন নার্স, কতিপয় কম্পাউণ্ডার ও একজন মিলিটারী শিক্ষানবিস অফিসার নিয়ে ছিল আমার স্টাফ।

সেকেণ্ড লেফটেন্যান্ট মাসুদ ছিল সেই মিলিটারী অফিসার।

মিলিটারী হাসপাতাল হলেও তার গুরুত্ব খুব বেশী ছিল না। পাবলিককে সেখানে চিকিৎসার সুযোগ দেওয়া হলেও যেহেতু ধারে কাছে ঘন বসতি সম্পন্ন লোকালয় ছিল না, ছিল না কোনো যুদ্ধ-বিগ্রহ তাই রোগীও অধিক হতো না সেখানে। কর্তৃপক্ষও হয়তো সে কারণে অধিক ডাক্তার নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন না।

হঠাৎ যদি কখনও পাকিস্তানী সৈন্যদের সাথে ভারতীয় সৈন্যদের গুলী বিনিময় হতো কিংবা গোপন আক্রমণের শিকারে পড়ে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর কোনো জোয়ান আহত হতো তবে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো আমাদের হাসপাতালে।

মাসুদ ছিল সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত একজন সামরিক অফিসার, তার পিতা ছিলেন ভারত সরকারের খেতাবপ্রাপ্ত সম্ভ্রান্ত সমাজপতি। অধিকৃত কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী সাদীকের খয়ের খা। মাসুদ ছিল শ্রীনগর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অন্যতম ছাত্র।। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক বলে বহুল পরিচিত। তাই ভারত সরকার তাকে বিশ্বাস করে সামরিক বাহিনীতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল। মুসলমানদের আনুগত্য আদায় করার জন্য এমন ধারা অনেক ভুল ভারত সরকার অধিকৃত কাশ্মীরে করেছিল।

এটা ১৯৬৫ সালের কথা। কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হবার আগে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় যে গোপন অভ্যুত্থান হয়েছিল আমি সেই সময়ের কথা বলছি। শেখ আব্দুল্লাহ আর আফজল বেগের মুক্তির দাবীকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান সরকারের উসকানিতে হয়েছিল সে অভ্যুত্থান।

মাসুদরা এবং আমরা পাশাপাশি গ্রামের বাসিন্দা। আমি ছিলাম শ্রীনগর মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। অনেক সময় বন্ধের পরে বাড়ী থেকে শ্রীনগর যাবার পথে আমরা একত্রে যেতাম। আমার পিতা গোঁড়া ব্রাহ্মণ হলেও মাসুদকে ঘৃণা করতেন না। তার পিতার সামাজিক প্রতিপত্তির কারণে তিনি মাসুদকেও বেশ সমীহ করতেন। মাসুদের

প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস। তাই চলতি পথে আমার খবরদারী করা এবং শ্রীনগরে মাঝে মাঝে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য তিনি তাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করতেন। মাসুদও তার দায়িত্ব বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতো।

অবাধ মেলামেশার জন্য ক্রমান্বয়ে মনের অজান্তে মাসুদের প্রতি আমি খানিকটা আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম সেই ছাত্রী জীবনেই। কিন্তু মাসুদকে তা জানার সুযোগ দিতাম না কখনো। সে ছিল অতিশয় গম্ভীর প্রকৃতির। আমার প্রতি সে কখনও সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ করতো না। অন্ততঃ আমি বুঝতে পারি এমন ভাবভঙ্গী সে কখনও প্রকাশ করতো না। আমি তাকে ভালো করে বুঝতে পারিনি চার বছরের মধ্যে।

বরাবরই রূপের একটা গর্ব ছিল আমার। পুরুষদের বড় একটা আমল দিতাম না আমি কোনদিন। গায় পড়ে মাসুদের সাথে আমি তাই এমন ব্যবহার করতাম না যাতে সে আমার মনের ভাব বুঝতে পারে। আমি চাইতাম; সেই আগে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করুক। পরে আমি সাড়া দেবো।

মাসুদ আমাকে উপেক্ষা করা সত্ত্বেও কেন জানি তাকে অবহেলা কিংবা ঘৃণা করতে পারতাম না। মনের কোণে একটা প্রীতির একটা শ্রদ্ধার ভাব বিরাজ করতো আমার। ঠিক ভালবাসা যাকে বলে তা যেন গড়ে উঠতে পারতো না। বড় ভাইয়ের ন্যায় 'আপনি' করেই সম্বোধন করে এসেছি বরাবরই। সে বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও আমাকে 'তুমি' করে কথা বলতো না। মনের টান থাকলেও সম দূরত্বে রয়ে গিয়েছিলাম তাই শেষাবধি।

কিন্তু কে জানতো, কর্মজীবনে দুই ভিন্ন প্রকৃতির পেশা গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা আবার একত্র হবো? একই হাসপাতালে চাকরি করার সুযোগ পাবো? পরস্পরের সান্নিধ্যে নতুন করে আসার ফলে একের প্রতি অন্যে আসক্ত হয়ে পড়বো? কয়েক বছরের ব্যবধানে আমি মাসুদকে ভুলতে বসেছিলাম। সেও হয়তো আমাকে।

যা বলছিলাম, মেজর জেনারেল করণ সিংহ হাসপাতালে এসেছিলেন তার ট্রুপের আহত সৈনিকদের খোঁজ খবর নিতে। আমার অফিসের বড় টেবিলটার পার্শ্বে উপবেশন ক'রে জানতে চাইলেন নানা তথ্য। সব সংবাদ তাকে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলো সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট মাসুদের। সংবাদ প্রেরিত হলো তার দপ্তরে। ফাইল হাতে পর্দা ঠেলে সে আমার কক্ষে প্রবেশ করে জাঁদরেল অফিসার কারণ সিংকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হলো যেন। আমাদের দু'জোড়া চোখ তার দিকে নিপতিত হতেই সে সামরিক কায়দায় করণ সিংকে অভিবাদন জানালো। কিন্তু ব্যস্ততা ও অহেতুক ভীতির জন্য তার হাতের ফাইলটা সশব্দে মেঝের উপর পড়ে গেল। তার রকম সকম দেখে আমি হেসে ফেললাম। করণ সিংও তার লম্বা গোঁফের মধ্যে মৃদু হাসলেন। জড় পদার্থের ন্যায় মাসুদ এটেনশন হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

পরিবেশটা হাল্কা করার জন্য আমি তাকে বললাম,—ফাইলটা নিয়ে আসুন। কয়েকটা বিষয় জানার দরকার আছে। মাসুদের জড়তা তখনও তিরোহিত হলো না। সে যন্ত্র চালিতের ন্যায় ফাইলটা উঠিয়ে নিয়ে টেবিলের কাছে এলো। নির্বাক চাহনিতে জানতে চাইল আমাদের প্রয়োজন।

করণ সিং তার প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে চাইলেন মাসুদের কাছে। ফাইলটা হাতের উপর খুলেই সে পাতা উলটিয়ে জবাব দিতে লাগলো। আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম,— বসুন না। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

তবুও সে বসলো না। করণ সিংও তাকে বসতে বললেন না। বড় খারাপ লাগলো আমার। মাসুদের জড়তা দেখে আমার বিরক্তি লাগলো। ভদ্রতায় বাধলো।

মাসুদ তবুও চেয়ারে উপবেশন করলো না। এটেনশন অবস্থায় দাঁড়িয়ে তার কর্তব্য সমাপন করলো।

আমি জানতাম তার পারিবারিক পরিচয়, তার পিতার প্রভাব প্রতিপত্তির খবর। একজন পাঞ্জাবী শিখকে এতো সমীহ করার কারণ আমি খুঁজে পেলাম না।

কার্য সমাধা ক'রে প্রত্যাবর্তনের সময় আমাকে সঙ্গে করে গাড়ী পর্যন্ত নিয়ে গেলেন করণ সিং। যাত্রার পূর্বে কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় কথা বলার পর তিনি আমাকে বললেন,— দেখুন মিস মীরা, পেশা আপনার ডাক্তারী হলেও এখন আপনি পদাধিকার বলে একজন সামরিক অফিসার। সামরিক বাহিনীর আদব-কায়দা তাই আপনার জানা দরকার। মাসুদ একজন জুনিয়ার অফিসার। আপনি ক্যাপ্টেন। আপনার উচিত নয় তাকে আপনার সামনে বসতে দেওয়ার অনুমতি প্রদান করা। এটিকেট সবাইকে পুরোপুরি পালন করতে হয় আমাদের ডিপার্টমেণ্টে। আইন-শৃঙ্খলা বড় কড়া জিনিস।

—কিন্তু মাসুদ সাহেব তো আমার বয়সে বড়। সামাজিক প্রতিপত্তিও তার বেশী।

—হতে পারে। ও সব ভুলে যান। এটিকেট মনে রাখবেন সব সময়। সৌজন্য আর সম্ভ্রমের স্থান নেই এখানে। এখানে সব কিছু চলবে মেশিনের মতো। মাসুদ সামরিক কলেজ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে। এটিকেট সে জানে। কিন্তু আপনি তাকে সুযোগ দিলে নষ্ট হয়ে যাবে। ক্ষতি হবে আমাদের বিভাগের। দূরত্ব রেখে চলবেন সব সময়। জুনিয়ার অফিসারের সাথে যেমন ব্যবহার করা উচিত তেমন করবেন।

— চেষ্টা করবো।

—চেষ্টা করবো নয়। পালন করতে হবে।

—আচ্ছা। ধন্যবাদ আপনার উপদেশের জন্য।

—ধন্যবাদ।

বিদায় নিলেন করণ সিং। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম যেন। মেজর জেনারেল করণ সিংহের উপদেশ আমার মনঃপুত হচ্ছিল না। কেমন যেন লাগছিল; তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম তাই।

হাসপাতালে উচ্চ শিক্ষিত বলতে ছিলাম আমরা দুটো প্রাণী। তাও মিশতে পারবো না খোলা মনে একে অন্যের সঙ্গে, এ কেমন আইন? কেমন শৃঙ্খলা? বিদ্রোহী হয়ে উঠলো আমার মন।

সাতদিন হলো সে হাসপাতালে এসেছে ; দেখা সাক্ষাৎও হয়েছে কিন্তু কাজ করি দুজন দু'কক্ষে। সময় করে দুদণ্ড গল্প করারও সুযোগ পাইনি। সেই প্রথম দিন কাজে যোগদান করতে এসে সে অভাবিতভাবে আমাকে দেখতে পেয়ে অবাক বিস্ময়ে শুধু প্রশ্ন করেছিল,—আপনি এখানে ? ভালই হলো তা হলে। ভাবছিলাম সামরিক হাসপাতালের চাকরি জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি কেমন করে কাটবে। মন্দ হলো না।

মাসুদ আমাকে দেখে আশ্বস্ত হলেও এই সাতটি দিনে আমি তাকে সাহচর্য দিতে পারিনি। পারিনি দু'দণ্ড একত্রে বসে মন খুলে আলাপ করতে। কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নতুন চাকরিতে এসে সেও গুছিয়ে নিচ্ছিল।

কিন্তু করণ সিংহের বিদায়ের পরে আর থাকতে পারলাম না। সোজা চলে গেলাম তার দপ্তরে। বিনানুমতিতে প্রবেশ করলাম মাসুদের অফিস ঘরে। আমাকে দেখেই সে তড়িৎ বেগে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আমি বাধা দিয়ে বললাম,—বসো তুমি। কী পাগলামি করছো ? একেবারে তুমি বলে ফেললাম।

—কেন ? সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলো সে।

—আমি তোমার বয়সে ছোট, তা জানো ?

—মেয়েরা বয়সে সব সময় ছোটই থাকে !

একটু হালকা হতে পারলো সে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বললো,

—কিন্তু চাকরীতে তো আপনি আমার সিনিয়র, 'বস্'।

—রাখো তোমার 'বস্'। চাকরি অন্যের কাছে করো, আমার সাথে নয়। আপনি টাপনি নয়, 'তুমি' বলতে হবে আমাকে।

—না না। তাই কি হয় ?

—আলবৎ হবে। আদেশ করলাম আমি।

এবার সে হেসে ফেললো। বললো,— বসের সকল আদেশ পালন করতে প্রস্তুত এ-বান্দা।

নাটকীয় ভঙ্গিতে কথাগুলি বললো মাসুদ। আমার খুব ভালো লাগলো। মনে হলো, এটাই তার আসল রূপ। বললাম,—তাই যদি হয় তবে বসো, আমার আদেশ নিষেধ সুবোধ বালকের ন্যায় পালন করো।

—সে আর বলতে। কোন আদেশ পালন করতে হবে বলুন, ম্যাডাম! এ-বান্দা জান থাকতে কসুর করবে না।

—আবার দুষ্টুমি। ধমক দিলাম আমি। বললাম,—বিকেল হয়েছে, চলো একটু বেড়িয়ে আসি। এদিকটা ভালো করে দেখা হয়নি আমার।

—কিন্তু সেটা কি ঠিক হবে? লোকে দেখবে না?

—আবার তর্ক! আমি কি পর্দানশীন মুসলিম নারী?

—চলুন। সামরিক বিভাগে বিনা দ্বিধায় উপরওয়ালার আদেশ পালন করার নির্দেশ রয়েছে।

—চলুন নয়। বলো,—চলো।

হাসলো মাসুদ আমার প্রীতির শাসনাদেশ শুনে। কিন্তু বড় সীমিত সে হাসির জের। তার সুন্দর সুঢোল মুখ মণ্ডলের দিকে যদি সে সময় না তাকাতাম তবে জানতেই পারতাম না যে, আমার শাসনে সে পুলকিত হয়েছে, তার ধনুকের মতো জোড়া চোখের ভ্রুদ্বয় মণিদুটের সাথে উপরে উঠেছে ক্ষণিকের জন্য।

মাসুদের প্রতি আমার প্রথম যৌবনের দুর্বলতার স্মৃতি এই সময় আবার নতুন ক'রে মোচড় দিয়ে উঠলো। শুধু সময় অতিবাহিত করার জন্য নয়, তার মনের দৃঢ়তা পরীক্ষা করারও জেদ জাগলো আমার মনে। তাই নিতে চাইলাম তাকে হাসপাতাল থেকে দূরে বন্য পরিবেশে।

।। দুই ।।

নিজেই ড্রাইভ করে নিয়ে গেলাম তাকে হাসপাতাল থেকে অনেক দূরে। ইচ্ছা করেই ড্রাইভার নিলাম না সাথে। দূরেও গেলাম।

ড্রাইভ করার সময় গল্প জমে না. মাসুদও স্বল্পভাষী। এক দ্রাক্ষা ক্ষেতের কাছে পৌঁছে তাই গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। মাসুদও আমাকে অনুসরণ করলো।

পায়ে পায়ে হেঁটে গেলাম অনেক দূরে। নানা ধরনের গল্প হলো আমাদের মধ্যে। ধর্মীয় ভেদাভেদ আ'র চাকুরীর শৃঙ্খলাবোধের কথা আমরা বিস্মৃত হলাম। সত্যি কথা বলতে কি, মাসুদের প্রতি বেশ দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলাম।

দৈহিক সৌন্দর্য ছাড়াও আর একটা বিশেষ চারিত্রিক গুণের অধিকারী সে, যা-নারীকে পাগল করে তুলতে পারে। যে-কোনো গর্বিতা সুন্দরী তাকে প্রাণ উজাড় করে ভালবেসে আনন্দ পেতে পারে। দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে আমার নিজেরও একটা গর্ব ছিল বরাবর। যার জন্য কোনো পুরুষকে এতো বয়স পর্যন্ত আমল দেইনি। ছেলেদের বেহায়াপনা ছিল আমার কাছে বিরক্তিকর। দু'চোখের বিষ। অথচ রূপের দিক থেকে তারা কেউ কম ছিল না। অর্থেরও অভাব ছিল না কারো। আমি সাধারণ ব্রাহ্মণের কন্যা হয়েও তাদের উগ্র প্রেমের কাছে নতি স্বীকার করতে পারিনি। আসক্ত হতে পারিনি তাদের অর্থের মোহে।

কিন্তু দর্পহরি মধুসূদন আমি ধরা পড়ে গেলাম শান্তশিষ্ট মাসুদের কাছে। উপযাচক হয়ে প্রেম নিবেদন করতে উদ্যোগী হয়ে পড়লাম গোধূলি লগ্নের সেই অলস মুহূর্তে। কিন্তু নির্লিপ্ত মাসুদের গুরু গম্ভীর ব্যক্তিত্বের নীচে প্রতিবারেই নির্মমভাবে পিষ্ট হলো আমার প্রতিটি এটেমপ্ট। হাল ছাড়লাম না তবু। হাবভাবে. কথাবার্তায়, গল্পের প্লট নির্বাচনে বেশ ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলাম আমি, কিন্তু মাসুদ

যেন কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারছিল না। সে দস্তুর মতো আমাকে উপেক্ষা করছিল। নির্বিকারভাবে শুধু সঙ্গদান করছিল।

মাসুদের ঐ নির্বিকার নিশ্চেষ্টতাই আমাকে দুর্বিনীত করে তুললো। পর পর প্রচেষ্টার ব্যর্থতা আমার নারীত্বকে চরমভাবে আঘাত করলো। অপমান করলো আমার গর্বিত রূপ যৌবনকে। বুঝতে দিলাম না তাকে আমার মনের আক্রোশ। প্রত্যাবর্তন করলাম হাসপাতালে। পথে একটা কথাও বললাম না তার সাথে। মাসুদকে বিদায় দিয়ে প্রবেশ করলাম শয়ন কক্ষে। রোগীদের খোঁজ খবর নেওয়া হলো না আর। পুরুষ মানুষ হলে হয় তো প্যাকেটের পর প্যাকেট সিগারেট পুড়তো। আমার পুড়লো দেহ-মন-হৃদয়। নিদ্রাভিভূত হবার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। মাসুদের মুখ আর না দেখার জন্য যতবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম, ততবার তাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করলাম ততো ঘনিষ্ঠ ও দুর্বিনীতভাবে যেন তার কথা মনে পড়তে লাগলো। তার উপেক্ষার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আমার মন উতলা হয়ে উঠলো।

আমি স্থির করলাম, আরও বেশী ক'রে ধরা দেবো তাকে। নানা-ভাবে তাকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করবো। সুন্দরী যুবতীর প্রতি কোনো যুবক বেশীদিন উপেক্ষা প্রদর্শন করে থাকতে পারে না, বিশেষ করে সে সুন্দরী যদি তাকে ফাঁদে ফেলার জন্য সচেষ্ট থাকে।

আমিও তাই থাকবো। এত বয়স পর্যন্ত যা করিনি এখন গুরুত্ব পূর্ণ পদে আসীন থেকেই তাই করবো। দেখবো মাসুদের চরিত্রবল কত দৃঢ়। কতদিন সে আমার ন্যায় কাশ্মীরী আপেলকে উপক্ষা করতে পারে; পারে অবহেলা করতে। ফাঁদে তাকে নিশ্চয় ফেলতে পারবো; আর একবার তাকে আটকাতে পারলে হুইলে গাঁথা মাছের ন্যায় খেলিয়ে বেড়াবো অথৈ পানিতে। ছেড়েও দেবো না কূলেও উঠাবো না। আমার প্রতি অবহেলা আর উপেক্ষার প্রতিশোধ নেবো এইভাবে।

ভাবতে বেশ ভালো লাগলো। উত্তেজনায় মনটাও কেমন যেন হালকা হলো। তাই স্থির করলাম, পররবর্তীদিন বিকেলেও নিয়ে

যাবো তাকে সেই দ্রাক্ষাক্ষেতের পার্শ্বে। সুন্দরী যুবতীর সংসর্গ উপভোগ করার জন্য না হোক উপরওয়ালার আদেশ মান্য করার জন্য সে নিশ্চয় সাহচর্য দানে আপত্তি করবে না। রিক্রিয়েশন তারও প্রয়োজন। তখন কিন্তু বেশী আমল দেওয়া হবে না তাকে। বেশ খানিকটা উপেক্ষা প্রদর্শন করবো। আকর্ষণ বাড়বে তাহলে। অন্ততঃ আমার বিমর্ষতা নিয়ে মনে মনে চিন্তা করবে। আর সে চিন্তাই আমার প্রতি তাকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করবে।

মাসুদকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে আমি নিজেই তার প্রতি যেন অহেতুক আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলাম আরও গভীরভাবে। অস্থির হয়ে পড়লাম ক্রমাণ্বয়ে। শয্যা ত্যাগ করে দরজা খুললাম। বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তার ঘরে তখনো আলো জ্বলছে। বুঝলাম সে শয্যা গ্রহণ করেনি। হয়তো কাজের ভেতর ডুবে গেছে।

রাগ হলো মনে। অভিমান হলো নিজের উপরে। কেন আমি শুধু শুধু হাওয়ার সঙ্গে ঝগড়া করছি! যাকে নিয়ে এতো চিন্তা ভাবনা করছি সে কিনা দিব্বি নিবিষ্ট চিত্তে কাজ করে যাচ্ছে!

না, নিজেকে এতো ছোট করা যায়, না। করণ সিং ঠিকই বলেছেন—অধস্থন কর্মচারীকে বেশী লাই দেওয়া উচিত হয় না। তার সম্বন্ধে আমি আর চিন্তা করব না। ফিরে এলাম নিজ কক্ষে। আশ্রয় নিলাম আবার শয্যায়। দেহ এলিয়ে দিয়ে ঘুমানোর বৃথা চেষ্টা করলাম কিছুক্ষণ।

স্থিরভাবে শুয়ে থাকা তবু সম্ভব হলো না। যার মুখ দেখবো না বলে বার বার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মনের অগোচরে আমার পা দু'খানা ধীরে ধীরে তার শয়নকক্ষের সম্মুখে নিয়ে আমাকে হাজির করলো। টোকা দিলাম তার দরজায়।

মাসুদ তখনও ঘুমায়নি। কার সঙ্গে যেন আলাপ করছিল। একটু পরেই দরজা খুলে আমাকে দেখে অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো।

—আপনি!

হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরলাম তার। বললাম আবার আপনি! তুমি বলতে পারো না?

—মনে ছিল না।

—কার সাথে কথা বলছিলে?

—কই! কারো সাথে নয় তো?

অস্বাভাবিক লাগলো তার কণ্ঠস্বর। নেশা-টেশা করো না তো? প্রশ্ন জাগলো মনে। মুখে বললাম,—নিশ্চয় কেউ আছে তোমার ঘরে। তোমাকে কথা বলতে শুনলাম যে।

—কথা বলতে লোকের দরকার হয় নাকি? একাকী কি বলা যায় না?

—হেয়ালী রাখো। সত্যি কথা বলো। একটু রাগ দেখালাম আমি।

—এতো রাত্রে চুপিসারে দেবীর আগমন হলো কেন জানতে পারি কি? কোনো আদেশ জারি করার প্রয়োজন আছে কি?

—এতদিন তোমাকে বড় গোবেচারা মনে হতো আমার। কোনো প্রশ্ন করে প্রয়োজনীয় উত্তর ছাড়া বাড়তি কিছুই পেতাম না। এখন বাচাল মনে হচ্ছে তোমাকে।

স্মিতহাস্যে মাসুদ আমার চোখের উপর তার মোহনীয় চোখের মণি দুটো স্থির করে বললো,—ক্ষমা করুন দেবী। প্রগলভতা যদি কিছু হয়ে থাকে করজোড়ে ক্ষমা চাচ্ছি। অপরাধ নেবেন না।

—তুমি বড় বেশী দুষ্টু। বাজে কথা রাখো। দেবী টেবী বলে আমাকে ভোলাতে পারবে না। একটু গম্ভীর হয়ে বললাম আমি। আমি পরোক্ষে জানতে চাইলাম তার গোপন সঙ্গিনীর কথা। ও কিন্তু সে পথে গেল না। আমার ঔৎসুক্যকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য কথার মোড় অন্যদিকে নিয়ে গেল। বললো,—তোমরা তো মায়ের জাতি, দেবী তো বটেই। মিথ্যা কথা আমি বলি না।

—তাই যদি সত্যি হয় তবে বলো তুমি কার সঙ্গে প্রেমালাপ করছিলে ?

—প্রেমিক তো প্রেয়সীর সাথেই প্রেমালাম করে। তোমার প্রেয়স অন্য কারো সাথে অভিসার করে নাকি?

দুষ্টুমিভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে। আমার মনে তখন রং ধরেছিল। কোথায় যেন আশার ক্ষীণ আলোকে দৃষ্টিগোচর হলো। বললাম,—আমার প্রেয়সের সঙ্গে অভিসারে বের হলেও তাকে ধরা যায় না। চোখে ধুলো দিয়ে রজনীর অন্ধকারে সে অন্যের সাথে খোশগল্প করে। ধরা পড়লে লজ্জা পায় না। গোপন করার বৃথা চেষ্টা করে।

আমার হেয়ালীর অর্থ সে ঠিকই বুঝতে পারলো। সেও হেয়ালী করে জবাব দিলো,—এ তো ভারী অন্যায় কথা। তোমার সাথে ভালোবাসার অভিনয় করবে, অভিসারে বের হবে অথচ উপেক্ষা করবে। গোপনে অন্যের সাথে খোশালাপ করবে। এ কেমন কথা? তার দুমাসের ফাঁসী হওয়া উচিত। তোমার মতো সুন্দরী যুবতীর প্রেমকে যে উপেক্ষা করতে পারে সে মানুষ নয়, পাষাণ। না না, তা হতে পারে না। পুরুষ মানুষ এতো নিষ্ঠুর হতে পারে না।

মাসুদের শেষ কথাগুলি শুনে আমার হৃদয় এক অনাস্বাদিত আনন্দে ভরে গেল। আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। বিস্মৃত হলাম আত্মমর্যাদা-বোধ, ভুলে গেলাম পদমর্যাদার পার্থক্য ও ধর্মানুশাসনের আদেশ। স্মিতহাস্যে তার কাশ্মীরী আপেলের ন্যায় মুখে দু আঙুলের একটা চাপ সৃষ্টি করে আবেগ বিজড়িত কণ্ঠে বললাম,—তুমি বড় দুষ্টু। সামরিক বাহিনীতে চাকরী নেওয়া উচিত হয়নি তোমার।

- দুষ্টুরাই তো সামরিক বিভাগে ভালো করতে পারে। নিষ্ঠুর হতে পারলে পদোন্নতি হয় আরও দ্রুত। হাসতে হাসতে জবাব দিলো সে। নিষ্ঠুর কথাটা যেন ইচ্ছা করেই ব্যবহার করলো। আমি তাই পাল্টা প্রশ্ন করলাম,

—তাই বলে মেয়েছেলের সাথেও নিষ্ঠুরতা ?

—মেয়েছেলে কে? কার প্রতি আমি নিষ্ঠুর হলাম?

—আমার প্রতি। আমি যে-তোমাকে ভালবাসি তা কি তুমি বুঝতে পারো না? আমার ভালবাসার প্রতি অমর্যদা প্রদর্শনের অর্থ কি নিষ্ঠুরতা নয়? কণ্ঠে কৃত্রিম গাম্ভীর্য প্রকাশিত হলো আমার। সে কিন্তু বেশ অবাক হবার ভান করে প্রশ্ন করলো,—তুমি কি আমাকে ভালবাস? আমি না মুসলমান?

—কেন? মুসলমানরা কি মানুষ নয়?

—তোমরা তো তাই মনে করো।

—কে বলেছে?

—প্রতিটা কাশ্মীরী হিন্দুর প্রত্যেক দিনের প্রতিটি ব্যবহার বলেছে।

—মিথ্যা কথা। আমি বিশ্বাস করি না। তোমরা বরং আমাদিগকে আপন ভাবতে পারো না। তোমাদের বিবেচনায় পাকিস্তানের মুসলমানরাই তোমাদের আপন লোক। আমরা প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও পর।

—এমনি করে ভাবতে বাধ্য করেছ তোমরা। একটা অদৃশ্য বেড়াজাল সৃষ্টি করেছ তোমরা সমাজের মধ্যে।

—আমি যদি সে বেড়া ভেঙ্গে তোমাকে আপন করে পেতে চাই?

প্রশ্ন করলাম আমি। সে পূর্বের মতোই মনের কাঠিন্য বজায় রেখে জবাব দিলো,—সাধনা করতে হবে সেজন্য। পরীক্ষা দিতে হবে প্রথমে। আমি সহজে কারো বিশ্বাস করি না। সুন্দরীদের তো নয়ই।

—কেন, সুন্দরীরা কি বিশ্বস্ত হতে পারে না? প্রশ্ন করলাম আমি কিছুটা অবাক হয়ে। আসলে ইতিমধ্যে আমার হাবভাব ও কথাবার্তায় মোহিত হয়ে মাসুদও আমার প্রতি ভেতরে ভেতরে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিল কিন্তু ধরা দিতে পারছিল না। সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছিল না আমাকে হয় তো। অবশ্য তার যুক্তি সংগত কারণও ছিল। সে সময় তার উপর মুক্তি সেনারা যে-গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছিল তাতে সামরিক বাহিনীর একজন বিধর্মী স্ত্রীলোকের প্রেমে আবদ্ধ হওয়া তার পক্ষে তখন আত্মঘাতি ব্যাপার ছিল। তাই সে নির্জন রাত্রে একজন গরবিনীকে

নিঃশেষে নিবেদিতা জেনেও সহজে গ্রহণ করতে পারছিল না। অবশ্য তখন আমি তা উপলব্ধি করতে পারিনি। বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। তার সঙ্গে আমার সকল ব্যবধান বিদূরিত হবার পর।

যাক সে কথা। আমার প্রশ্নের জবাবে সে কণ্ঠের দৃঢ়তা বজায় রেখেই বললো,—সুন্দরীরা এমনিতেই ভয়ঙ্কর, তার পর যদি কোনো সুন্দরী উপযাচক হয় তবে তাকে ভয় না করা বোকামি।

— কেন?

—কারণ তারা ভয়ঙকর সুন্দর।

—আমি কি তোমার দৃষ্টিতে ভয়ঙ্কর?

—পরীক্ষা এখনও শেষ হয়নি।

— নিরাশ হবার কারণ আছে কিছু?

— তেমন কিছু এখনও নজরে পড়েনি। তবে আমাদের সাবধান হয়ে চলতে হবে। অন্যের চোখে ধরা পড়া চলবে না।

— সত্যি বলছে মাসুদ? মনের আবেগে জড়িয়ে ধরলাম তাকে। একে দিলাম তার গণ্ডে চুম্বন। সেও প্রতিশোধ নিলো।

মাসুদের কক্ষ থেকে পুলকিত মনে পলাতক আসামীর ন্যায় অর্ধ-ছুটন্ত অবস্থায় চলে এলাম স্বীয় কক্ষে। আমার এ গোপন অভিসার দেখার জন্য কোথাও কেউ ওঁৎপেতে রয়েছে কিনা তা লক্ষ্য করার কথা মনে হলো না। শুধু মনে হলো, আমি পেয়েছি। সারা জীবন ধরে যেমনটি চেয়েছি ঠিক তেমনটি পেয়েছি। এ পাওয়ায় খাদ নেই। নেই কোনো সন্দেহ কিংবা শঙ্কা।

রজনী তখন গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। মারাত্মক আঘাতপ্রাপ্ত রোগীরাও তখন অচেতন। আমরা দুটো প্রাণী স্বল্প ব্যবধানের দুটো কক্ষে অপার আনন্দের আতিশয্যে ভবিষ্যতের জাল বুনছি মানসনেত্রে। অদ্ভুত আনন্দানুভূতি অনুভব করছি দুজনের হৃদয়ে। অপার্থিব শিহরণ দুজনের মনে। সে আনন্দ, প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করার পরে নিষ্কণ্টক ভাবে

সিংহাসন প্রাপ্তির চাইতেও সুখকর। সে আনন্দের তুলনা হয় না, উপমা দেওয়া যায় না।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। সকালে ঘুম ভাংলো বেশ দেরীতে। দরজায় একটানা খটখট আওয়াজ আমার সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করল। বিরক্তির সাথে এগিয়ে গেলাম দরজার কাছে। অবিন্যস্ত দেহাবরণও গুছিয়ে নিলাম না। মনে হলো, মাসুদ না হয়ে যায় না। প্রাণ দিয়ে যাকে গ্রহণ করেছি তার কাছে আবার বিন্যস্ত পোশাকের প্রয়োজন কি? হয় তো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছে, হয় তো অধৈর্য হয়ে নিজেই নক করছে। দারোগান কিংবা কোনো নার্সের সাহস হতে পারে না আমার দরজায় শব্দ করার।

কিন্তু দরজা খুলেই অপ্রস্তুত হলাম। দরজায় অধৈর্য হয়ে যে পুরুষ ব্যক্তিটি আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সে আমার প্রাণ প্রিয় মাসুদ নয় মেজর করণ সিং।

অভাবিত ধাক্কায় মনটা খারাপ হয়ে গেল। আরো খারাপ হলো করণ সিংহের বাজখাই চেহারা দেখে। বিরক্তির সাথে প্রশ্ন করলাম—এতো ভোরে যে! ব্যাপার কি?

—ব্যাপার ভালো নয়। গত রাত্রে একটা নতুন বিপদে পড়তে হয়েছে আমাদের। আমাদের বাহিনী যখন পীরবাবার অভিমুখে রাত্রের অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন অকস্মাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা কয়েকটি মাইন বিদীর্ণ হয়ে আমাদের তিন ডজনের মতো জোয়ানকে আহত করেছে, কয়েকটি ট্রাক ও তিনটি ট্যাঙ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

—ভারী দুসংবাদ তো! সহানুভূতি জানালাম আমি।

—দুসংবাদ তো বটেই। দুশ্চিন্তার কারণও বটে। পর পর দুবার একই ট্রুপের উপর একই পদ্ধতিতে গোপন আক্রমণ চালানো হলো অথচ আমরা পূর্বাহ্নে কিছুই জানতে পারলাম না। গতবার আমাদের প্লান আগেই করা হয়েছিল। সরকারী নির্দেশে আরম্ভ হয়েছিল আমাদের সে যাত্রা। গোপনসূত্রে মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা হয়তো সে সংবাদ সংগ্রহ করে

পূর্বাহ্নে মাইন পুতে রেখেছিল। কিন্তু এবার তারা জানলো কেমন করে? প্রায় পঞ্চাশটি মাইন আমাদের গতিপথে ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল। হয়তো পুতে রাখার সময় হয়নি। সময়ের স্বল্পতার জন্য এমন করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা।

— হতে পারে। বললাম আমি।

—হতে পারে নয়, তাই হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, আমাদের সে গোপন পরিকল্পনার কথা তারা জানতে পারলো কেমন করে? বিস্ময়ের সাথে বললেন করণ সিং।

—সত্যই তো!

—মাসুদ আমার পরিকল্পনা দেখেনি। সে সুযোগ সে পায়নি, আপনাকেও তো সন্দেহ করতে পারিনা। অথচ বিশ্বাস করুন ডাক্তার। আপনার টেবিলে বসেই আমি আমাদের নতুন ঘাঁটিতে যাবার পরিকল্পনার খসড়া তৈরী করি। ঘাঁটিতে পৌঁছেই প্রস্তুতি আরম্ভ করি। শত্রুপক্ষ সময় পেলো কোথায়? সংবাদ সংগ্রহ করলো কোত্থেকে? দু একটা দুর্ঘটনা যদি ইতি-পূর্বে হতো তবে না হয় বুঝতাম আগেই তারা মাইন ছড়িয়ে রেখেছিল অনুমানে। তা তো নয়। রাষ্ট্রের অন্ধকারেই করা হয়েছে তা।

— তা ঠিক। কিন্তু এর হদিস আমি আপনাকে দিতে পারবো না। আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগকেই আবিষ্কারের দায়িত্ব নিতে হবে তা। দলের মধ্যেও শত্রু থাকতে পারে।

— অস্বাভাবিক নয়। কাশ্মীরের প্রতিটি মুসলিম নাগরিক আমাদের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। আমাদের গতিবিধি তাদের কাছে অসহ্য। আমাদের উপস্থিতি তাদের বিরক্তির কারণ। তারপর পাকিস্তান সরকার গোপন পথে অসংখ্য সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীকে পাঠিয়েছে কাশ্মীরের অভ্যন্তরে। মুক্তি সেনার নামে তারা মিশে গেছে স্থানীয় কাশ্মীরীদের সাথে। চেহারা-সুরুৎ হাব-ভাব, চাল- চলন, ভাষা-ধর্ম সব এক হওয়ায় পূর্বাহ্নে আঁচ করাও কঠিন। বড় সমস্যায় পড়েছি আমরা।

শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খানের বুদ্ধির কাছে হার মানতে হয় কি না তাই ভাবছি। অনুপ্রবেশকারীরা স্থানীয় মুসলমানদের এমনভাবে উত্তেজিত করছে যে, অচিরে হয়তো তারা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসবে।

—কি হবে তা হলে? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—কি আর হবে! পণ্ডশ্রম হবে, অর্থের অপচয় হবে, আর হবে জগদ্ব্যাপী দুর্নাম।

করণ সিংহের কথা শুনে ভয় পেয়ে গেলাম। করণ সিং আবার বললেন, কাশ্মীরের প্রতিটি মানুষ স্পাই। কোনো না কোনো গোপন সংবাদ কোনো না কোনো প্রতিষ্ঠানের কাছে তারা সরবরাহ করে। কাউকে বিশ্বাস নেই। এরা মনের কথা কি করে জানতে পারে তাই বুঝি না। কাল কথায় কথায় আপনাকে শুধু বলেছিলাম আমাদের ঘাঁটি বদলের কথা। মাঝে সময় ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টা। এর মধ্যে শত্রু শিবিরে আমাদের গোপন সংবাদ ঠিক পৌঁছে গেল। তারাও তাদের কর্মীদের নিয়োজিত করতে সক্ষম হলো আমাদের বিপুল ক্ষতি সাধনে। এতো দ্রুতগতিতে ও নিখুঁতভাবে তারা সে কার্য সমাধা করলো যে, আমাদের সুশিক্ষিত সদা সতর্ক সামরিক বাহিনীও টের পেল না। শত্রুর শিকারে পরিণত হলো।

মেজর করণ সিংহের নিকট থেকে এসব লোমহর্ষক গল্প শুনে আমার হৃদয় মন ভীত হয়ে পড়লো। বললাম,—এদের কোনো প্রকারে কি আবিষ্কার করা যায় না? আদর্শ শাস্তি দিয়ে নিরস্ত করা কি সম্ভব নয়?

—দুচার জন সেপাইকে হয়তো ট্রেস আউট করা গেল, তাদের মৃত্যুদণ্ডও প্রদান করা হলো কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে যারা মিশে গেছে তাদের ধরা যাবে কেমন করে? তারা কাশ্মীরভূমি থেকে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীকে বিনাশ করার জন বদ্ধ পরিকর, তার কি হবে? বললাম তো, আইয়ুব খান পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার কাশ্মীরীকে পাঠিয়েছে এদেশে। ওদের চেনা কঠিন। তারা মিশে গেছে

সমাজের সাথে। খুঁজে বের করা দুষ্কর। আপনার হাসপাতালে ওদের কেউ আছে বলে আমার বিশ্বাস।

—আপনি তো ভয়ের কথা শুনালেন। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে এখন।

আমার ভীতকণ্ঠের অভিব্যক্তি শুনে মেজর করণ সিং মৃদু হাস্য করলেন। বললেন,—আমার তাই বিশ্বাস, নইলে হাসপাতালে বসে যে প্লান করলাম আমি, জানলো কেমন করে তা আইয়ুব খানের অনুপ্রবেশকারীরা। ওরা সর্বত্র গুপ্তচর রেখেছে। এখানেও আছে কেউ। আমি নিশ্চিত।

—সত্যি নাকি! আমি..... আমার কথা শেষ হবার আগেই পর পর কয়েকটি মিলিটারি ট্রাক হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়ালো। করণ সিং উঠে পড়লেন। মুখে বললেন,—আহত সৈনিকদের নিয়ে ট্রাক এলো। আমি দ্রুত চলে এসেছিলাম জিপ-এ। আপনি ব্যবস্থা করুন। অস্ত্রপচার করতে হবে অনেকের দেহে। বিস্তর রক্তপাত হয়েছে কয়েক জনের।

সামরিক গাড়ীর আওয়াজ শুনে সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ড মাসুদ ছুটে এলো তার দপ্তর থেকে। চার চক্ষুর মিলন হতেই সরম লাগলো আমার গত রজনীর অস্বাভাবিক ব্যবহারের কথা স্মরণ হওয়ায়। চোখ তুলে আর চাইতে পারলাম না আমার প্রেয়সের সুন্দর মুখ মণ্ডলের প্রতি। সেও কিছু বললো না—এমন কি প্রাত্যহিক নমস্কারও নয়। আমার ব্যস্ততা ছিল। বাথরুমে প্রবেশ করতে হলো দ্রুত—করণ সিং তাকে নিয়ে চলে গেলেন আহত রোগীদের কাছে।

।। তিন ।।

হাসপাতাল ভর্তি হয়ে গেল আহত সৈনিকে। তাদের আর্ত চীৎকারে কর্মচঞ্চলতা বেড়ে গেল আমাদেরও। মাসুদ এবং করণ সিং আমাদের বিস্তর সাহায্য করলেন। হিমশিম খেয়ে গেলাম আমরা সকলে। নার্সরা তো প্রাতঃভোজন গ্রহণ করার সুযোগই পেল না। শুধু নার্সদের কথাই বা বলছি কেন, আমরাও রইলাম বেলা ১২টা পর্যন্ত উপবাসী। মাসুদ সর্বক্ষণ আমার কাছে কাছে থেকে সুবোধ বালকের মতো আমার ফাই ফরমাস পালন করেছিল বলেই হয় তো ক্ষুধার কথা স্মরণ হয়নি। অপারেশন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হলে একটু স্বস্তি পেতেই খাওয়ার কথা মনে হলো আমার। মাসুদ ও করণ সিংকে দাওয়াত জানালাম আহার্য গ্রহণের। আমার প্রাণপ্রিয় তার মৌন সম্মতি জানালো, কিন্তু করণ সিংহের হয় তো মিলিটারী এটিকেটের কথা এতক্ষণে মনে হলো। তিনি মাসুদকে এড়িয়ে চলতে চাইলেন। মাসুদ তার উপরওয়ালার মানসিকতা অনুধাবন করতে পেরে বিষণ্ণবদনে চলে গেল আপন ডাইনিং হলে। করণ সিং প্রবেশ করলেন আমার খাবার ঘরে। একত্রে আহার্য গ্রহণ করলাম দু'জনে। মনটা আমার ভারী হয়ে উঠলো। করণ সিংহ কিছুই অনুধাবন করতে পারলেন না। এতো অল্প সময়ের মধ্যে আমার ন্যায় কঠোর হৃদয়া মেয়ের অন্তরকে মাসুদ কেমন করে কেড়ে নিলো অবাক বিস্ময়ে আমি তা চিন্তা করতে লাগলাম।

লক্ষ্য করলাম, এই কয়েকদিনের সাহচর্যে করণ সিংও আমার প্রতি দুর্বলতা অনুভব করতে আরম্ভ করেছেন। তার অধস্তন কর্মচারীর আস্তানায় না গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমার কক্ষে অবস্থান করা, মাসুদের আতিথ্য গ্রহণ না করে উপযাচক হয়ে আমার আহার্যে ভাগ বসানো, সন্ধ্যার পর চার মাইল দূরে অবস্থিত প্রেক্ষাগৃহে সিনেমা দেখার জন্য পীড়াপীড়ি করা প্রভৃতি অস্বাভাবিক কার্যাবলী বাদেও তার প্রতিটি কথা-বার্তা ও ভাবভঙ্গির মধ্যে আমি ন্যাকামো লক্ষ্য করতাম। ক্রমানুয়ে

বেশ বুঝতে পারলাম যে, তিনি আমার কুমারী দেহ উপভোগ করার জন্য উতলা হয়ে পড়েছেন। রোগীদের তত্ত্বাবধানের নামে ঘন ঘন হাসপাতালে আসার পশ্চাতে গোপন কারণ যখন আমার নিকট পরিষ্কার হলো তখন আমি ব্যবহারের কমনীয়তা পরিহার করলাম। বেশ কিছুটা রুক্ষ্ম হলাম।

অতিবাহিত হলো বেশ কয়েকটা দিন। মাসুদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা দ্রুততম গতিতে বেড়ে চললো। মনে প্রাণে আমি তার সহযোগিনী হয়ে পড়লাম। দিবা কর্মের অবসরে, রুটিন মাফিক কার্যের অবসানে এবং জ্যোৎস্না প্লাবিত রজনীর মৃদু সমীরণে আমরা বের হতাম অভিসারে। আদান-প্রদান করতাম একের হৃদয়কে অন্যের কাছে।

প্রথম দিকে আমার উদ্দেশ্য ছিল তাকে ফাঁদে ফেলা। তার চারিত্রিক দৃঢ়তার পরীক্ষা নেওয়া। ভাবতাম, যে-কোনো উপায়ে আমার প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্টি ক'রে, প্রেম নিবেদনের পর্যায়ে নিয়ে এসে তার পর খেলা দেখাবো। আমি নিজেকে মনের দিক থেকে শক্ত রাখার পরিকল্পনা করেছিলাম প্রথম থেকে। শুধু অভিনয়ের মাধ্যমে তাকে আকৃষ্ট করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। অবশ্য আমার প্রতি মাসুদের নির্লিপ্ততা একটু বেশী পরিমাণে ধাক্কা দিয়েছিল আমার মনে। সময় অসময় নিবেদিত প্রাণ নারীর ন্যায় প্রেমাভিনয় করতাম বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেতের নির্জন বনানীর মোহনীয় পরিবেশে। তবু পুরোপুরি বুঝতে পারতাম না তাকে।

আস্তানায় প্রত্যাবর্তন করে একাকী বিছানায় দেহ এলিয়ে দিয়ে ওর চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে তন্ময় হয়ে যেতাম। অবাক বিস্ময়ে ভাবতাম, কোন কারণে কেমন ক'রে আমার ন্যায় সুন্দরীর বাধাহীন আকর্ষণীয় সাহচর্য পাওয়া সত্ত্বেও সে অবলীলাক্রমে অবহেলা করতে পারে?

আমার বিফলতা ক্রমানুয়ে আমাকে দুর্নিবার করে তুলতো। গভীর রাত্রে কখনও কখনও তার দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যেতাম, কিন্তু নিশ্চিন্ত

মনে গভীর নিদ্রায় তাকে অভিভূত দেখে মনের দুঃখে ফিরে আসতাম। নিজের উপরই নিজের রাগ হতো।

ক্রমানুয়ে আমি বুঝতে পারলাম, মাসুদকে আমার প্রতি আকৃষ্ট করতে গিয়ে আমি নিজেই মনের অজ্ঞাতে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছি তার বন্ধনে। তার থেকে সরে আসা আমার পক্ষে কোনো প্রকারেই আর সম্ভব নয়। তাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না। তার অবহেলা হবে আমার আত্মহত্যার কারণ। তাকে জীবন সাথী হিসেবে পেতেই হবে আমাকে।

একদিন তাই বাধ্য হয়ে মনের সকল প্রকার আবিলতা আর সঙ্কোচ বিদূরীত করে পেশ করলাম আমার প্রস্তাব। গোধুলির আধো আলো আধো আঁধারে সে নির্নিমেষ নেত্রে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে বললো,—অনেক বাধা, অনেক প্রতিবন্ধকতা আসবে আমাদের মিলনের পথে। সে বন্ধুর পথ অতিক্রম করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আমি মনে করলাম, সে ধর্ম বন্ধনের কথা বলছে। তাই বললাম,—সে আমি পারবো। মনের দিক থেকে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ফেলেছি।

—আমি খুশী হলাম। ছোট্ট ক'রে জবাব দিলো মাসুদ। আমি কিছুটা আশান্বিত হলেও সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হতে পারলাম না। তাই বললাম,—তোমাকে খুশী করার জন্যই আমি এই সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছি বলে মনে করে থাকলে ভুল করেছ। আমি চাই তোমার সাথে মধুর বন্ধনে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ হতে। তোমাকে একান্তভাবে নিজের করে পেতে।

—বললাম তো, সে পথে অনেক বাধা আছে।

—সব বাধা আমি অতিক্রম করতে পারবো। তুমি আমাকে কথা দাও।

— কথা দেওয়ার আগে তোমাকে মুসলমান হতে হবে। পারবে?

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণের মেয়ে আমি। মনের দিক থেকে প্রস্তুত থাকলেও মাসুদের প্রস্তাব শুনে তবু যেন দেহটা মনের অলক্ষে কেঁপে উঠলো।

নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, —পারবো। ছোটবেলা থেকে ধর্মশাসনের উর্দ্ধে আমি। মানবতাকেই আমি বড় ধর্ম বলে মনে করি। তাই নামে হিন্দু থাকলেও তোমার সাথে মনের মিল গড়ে তুলতে যেমন আমি অন্যায় কিছু করছি বলে মনে করি না, নাম বদলিয়ে মুসলমান হলেও পাকা মুসলমানের জোশ আমার ভেতর পয়দা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। তবু যদি তুমি আমাকে মুসলমান বানাতে চাও আমার আপত্তি থাকবে না। তবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা হয় তো কোনোদিন আমাকে দিয়ে সম্ভব হবে না।

— তা না হোক। পরবর্তী আঘাত সহ্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য আমাদের উভয়েরই তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে সমগ্র ব্যাপারটা থাকবে গোপন। জা·বে শুধু মসজিদের এমাম সাহেব আর শরীফ ভাই।

—শরীফ ভাই কে ?

— পরে জানতে পারবে। তার ইচ্ছা মতোই তোমাকে মুসলমান হতে হবে—আমাদের বিয়ের কথা গোপন রাখতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আমাদের গোপন বিবাহ বন্ধনের কথা তার আদেশ ছাড়া প্রকাশ না করার। তার আদেশ অমান্য করলে কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা করলে তোমার এবং তোমার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জীবন বিপন্ন হবে।

মাসুদের কথা শুনে কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করলাম,— কে সেই শক্তিধর ভয়ঙ্কর শরীফ ভাইটি।

—বললাম তো, পরে জানতে পারবে।

মনে তখন আমার রঙিন ফুল ফুটেছিল। মাসুদকে ছাড়া জীবন-সংসার চিন্তা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। বললাম,—ঠিক আছে, বিশ্বাস ভঙ্গ করার পরিকল্পনা যখন আমার নেই তখন যে-কোনো শক্ত প্রতিজ্ঞা করতে আমি ভয় পাইনা। গোপন রাখতেও রাজী আছি। তবে আমার পিতামাতাকে মাসিক ভাতা পাঠানো থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

—সেটা হবে তোমার এবং আমার যৌথ কর্তব্য।

—তা হলে চলো আজই ইমান সাহেবের কাছে যাই।

রাজী হলো মাসুদ। সেও মনের দিক থেকে আমার প্রতি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আমার হাতখানা তার হাতের মধ্যে উঠিয়ে নিয়ে বললো,—ধর্মান্তরিত হওয়া কিংবা দুটো মন্তর পড়ে স্ত্রী হওয়া বড় কথা নয়। আমার জীবনের সম্পূর্ণ চাবিকাঠি সেচ্ছায় গ্রহণ করাই হলো বড় কথা। তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে এবং কাশ্মীরের অগণিত যুবককে মৃত্যুর দুয়ারে ঠেলে দেওয়ার অধিকার পাবে আজ। শরীফ ভাইয়ের সাথে আমি আগেই আলোচনা করে রেখেছিলাম অনুমানের উপর নির্ভর করে। তোমার গত কয়েকদিনের ব্যবহার আমাকে সে পথে পরিচালিত করেছিল। আজ নিশ্চিন্ত হলাম। তোমার সদিচ্ছা, কর্তব্য নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতাপূর্ণ বিশ্বস্ততা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। তোমাকে সহযোগিনী হিসেবে পাওয়ায় আমাদের যে উপকার হবে তা তুমি বুঝতে পারছ না।

—না, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। কেমন হেয়ালি লাগছে তোমার শেষ কথাগুলো। বললাম আমি। মাসুদ মৃদুহাস্যে বললো,—হেয়ালি নয়। মৃত্যুর মতো সত্য—স্বচ্ছন্দ। পরে বুঝবে। আজ সন্ধ্যায় ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে প্রাথমিক কাজটা সমাধান করে আসি।

সেদিন সত্যই রাত ১০ টায় আমি এক গোপন আস্তানায় হাজির হয়ে সৌম্যশান্ত এক যুবক-মাওলানার কাছে মুসলমান হয়ে এলাম। কিন্তু বিবাহ হলো না তখনই। কয়েকদিন পরে সে কাজ এমনি গোপনে সমাধা হবে বলে স্থির হলো। তবে জড়িয়ে পড়লাম পুরোপুরি মাসুদের সাথে।

কিন্তু মাসুদকে অন্তর দিতে গিয়ে কোন ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে নিজেকে বন্দী করে ফেলেছি তখনও আমি তা জানতাম না। তা যদি জানতাম তাহলে হয় তো প্রথম থেকে সাবধান হতে পারতাম। কিন্তু

যখন জেনেছিলাম তখন বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। উপায় ছিল না মাসুদকে পরিত্যাগ করা তাতে যদি আমাকে ফাঁসী কাষ্ঠে ঝুলতে হতো তবুও না।

করণ সিংহের সম্মুখে তার জড়তা প্রদর্শন এবং প্রথম দিকে আমাকে এড়িয়ে চলার কারণ ক্রমান্বয়ে আমার কাছে পরিষ্কার হলো। মনে হলো, মাসুদ সত্যিই একজন পয়লা নম্বরের অভিনেতা। তার মতো নিখুঁত অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব সামরিক বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে চাকুরী করেও স্পাইগিরি করা। সে ছিল শেখ আব্দুল্লার এক নম্বরের সাগরেদ। অধীনতা থেকে সে মুক্তি চাইত। মুক্ত করতে চাইত তার দেশের জনগণকে। সে ছিল স্বাধীন কাশ্মীরের পক্ষপাতি। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাই সে অধিকৃত কাশ্মীরের মুক্তি যোদ্ধাদের স্পাই হিসাবে যোগদান করেছিল সামরিক বাহিনীতে। ইচ্ছা করে ডিউটি নিয়েছিল মিলিটারী হাসপাতালে।

সারাদিন আহত সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের সাথে মিশে. তাদের সহানুভূতি প্রদর্শন করে আদায় করতো অনেক গোপন পরিকল্পার কথা। আমার গৃহে গোপন স্থানে টেপরেকর্ডর মেশিন ফিট করে করণ সিং ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থ সামরিক অফিসারের গোপন আলোচনা সংগ্রহ করতো। তারপর গোপন ট্রান্সমিটারের সাহায্যে অথবা দুধ ওয়ালার মারফতে প্রেরণ করতো উপযুক্ত সংস্থার কাছে সে গোপন খবর।

আমার কক্ষে প্রবেশ করে করণ সিংকে উপবিষ্ট দেখে তার হাত থেকে ফাইল পড়ে যাওয়া ও রাত্রে তার গৃহে আমার অকস্মাৎ গমনের সময় অন্যের সাথে সে আলাপ করছে বলে অনুমিত হবার কারণ আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

তার ট্রান্সমিটারের গোপন সংবাদ প্রাপ্তির পর দ্রুততার সাথে মাইন ছড়িয়ে রাখা হয়েছিল করণ সিংহের ট্রুপের গমনের পথে আর তাতে আহত হয়েছিল অগণিত জোয়ান। মাসুদের সে সংবাদ প্রদানের সময়ই আমি শুনতে পেয়েছিলাম তার কণ্ঠস্বর। সন্দেহ করেছিলাম অন্য নারীর অবস্থানের তার কক্ষে। মনে হয়েছিল সে যেন কথা বলছে কারো সাথে।

যাক সে কথা।

আমরা পরস্পর একাত্ম হওয়া সত্ত্বেও বাইরে সেই পূর্বের মতোই আচরণ করি। অফিসিয়াল প্রয়োজন ছাড়া অফিসে দেখা সাক্ষাৎ হয় না। বিকেলে অবশ্য নিয়মিত বেড়াতে যাই দুজনে পাহাড়িয়া অঞ্চলে অথবা বিস্তীর্ণ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মধ্যে। ঘণ্টায় পর ঘণ্টা অতিবাহিত করি সেখানে। মাসুদ যে এতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী, সে যে কোনো নারীকে এমন নিবিড় করে ভালবাসতে জানে তা নিজের জীবন দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণের অনেক পরে আমরা প্রত্যাবর্তন করতাম হাসপাতালে। চলে যেতাম নিজ নিজ কক্ষে। গভীর রাত্রে যখন সামরিক হাসপাতালে নিস্তব্ধতা নেমে আসতো আমি তখন একান্তভাবে তার কথা চিন্তা করতাম, তাকে চিরদিনের জন্য আপন করে পাবার সাধনা করতাম। আমার প্রতি তার নির্লিপ্ততা আমার মনোবেদনার কারণ সৃষ্টি করতো। বড় দুর্বিষহ ছিল সে বেদনা। অনেক দিন অনুযোগ করে বলতাম,—মাসুদ এ অভিসার আমার ভালো লাগে না। চলো, আমরা উভয়েই চাকরি ছেড়ে দেই। আমি পাশ করা ডাক্তার—তুমি একজন এম. এ.। অন্নের অভাব হবে না আমাদের। আমরা স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করবো।

—শুধু অন্ন সংস্থানের জন্য এ চাকরি করতে আসিনি আমি। এসেছি বৃহত্তর স্বার্থ চরিতার্থ করার অজুহাতে। তুমি যখন একবার আমাকে আপন করে নিয়েছ তখন মুক্তি তোমারও নেই।

—তা হলে কি বিয়ে করবে না? ঘর বাঁধবো না? বিয়ে যদি না করবে তবে ভয়ঙ্কর কর্মপদ্ধতির মধ্যে আমাকে জড়িয়ে নিলে কেন? নারী হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশিত হলো আমার কন্ঠে।

মাসুদের হৃদয় কিন্তু তাতে বিগলিত হলো না। তাকে এতটুকু বিচলিতও মনে হলো না। সে শান্তশিষ্ট ভাবে বললো,—আমি তোমাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম যে, খোদা তোমাকে সৃষ্টি করেছেন একান্ত আমার উপযোগী করে। সত্যি কথা বলতে কি আমার জন্যই। আরও

বুঝতে পেরেছিলাম, প্রয়োজনবোধে আমার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করার পথে তুমিই হবে আমার একমাত্র বিশ্বস্ত উত্তরাধিকারী। কিন্তু ধরা দেই নাই তবু। আমি যদি তোমাকে পাওয়ার জন্য সেই প্রথম দিন থেকে চেষ্টা করতাম তবে নিশ্চয় তোমাকে পেতাম না। তখন তোমার নিকট থেকে পেতাম অবহেলা আর অপমান। কিন্তু আমি তা চাইনি।

—থাক ওসব কথা। আমরা কি চিরদিন এমনি করে গোপন মিলনের দুর্বিষহ বেদনা ভোগ করবো? ভদ্রলোকের মতো সংসার করবো না? সন্তানের মা হবো না? পিতা হবে না তুমি?

মৃদু হাসলো মাসুদ। ভারী সুন্দর সে হাসি। বললো,—সব হবে, মাত্র একটা বছর।

—কিন্তু আজকাল মিলিটারী অফিসাররা, বিশেষ করে করণ সিং যেভাবে ঘন ঘন এখানে যাতায়াত আরম্ভ করেছেন তাতে তোমার বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। হয় তো তাদের মনে সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। আমার কিন্তু খুব ভয় হয়।

মাসুদ অনুচ্চ কণ্ঠে বললো—কোনো ভয়ের কারণ নেই লক্ষ্মীটি। ওরা আসে আমাকে সন্দেহ করে নয়। সন্দেহ করলে তারা আমাকে অন্যত্র বদলি করে দিতো। একা থাকতে দিতো না, হয়তো কোনোদিন অকস্মাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করে খানাতল্লাসি করতো। কিন্তু ওরা আসে অন্য কারণে। কেন জান?

—না। নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করলাম আমি।

—ওরা আসে তোমার দেহ উপভোগ করার জন্য। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করার আর একত্রে সিনেমা দেখতে যাওয়ার অর্থ তুমি বুঝতে পারো না! দেখতে পাবে, অল্পদিনেই তাদের পশুত্বের পরিচয় তারা প্রদান করবে। তারা তোমাকে রেহাই দেবে না।

—তা হলে আমি আর চাকরি করবো না।

—আমার অবস্থা তা হলে কী হবে লক্ষ্মীটি।

—আমি আর কোনোদিন সিনেমায় যাবো না তাদের সাথে। করণ

সিংহের আচরণ কিন্তু ইতিমধ্যেই ইতরতায় নেমে এসেছে। একদিন তিনি আমাকে চুম্বন ক'রে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। ওদের বিশ্বাস নেই। আমি আর পারবো না তাদের সাথে অভিনয় করতে।

—করতে হবে যে তোমাকে। তুমি এতটুকু ত্যাগ স্বীকার না করলে আমি গুপ্ত খবর পাবো কোথা থেকে! এ ব্যাপারে তুমিই তো আমার অবলম্বন। আর আমার আদেশ-নিষেধ ও সাবধানতাই তো মুক্তি বাহিনীর সম্বল।

—সত্যি নাকি।

- নাকি মানে? মৃত্যুর মতো সত্যি। অবশ্য আমার ন্যায় আরও কয়েকজন রয়েছে নীরব কর্মী, যারা জীবনকে মারাত্মক বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়ে এ কাজে নেমেছে। তুমি আমার সহযোগিনী। তাই তোমাকে সব বলতে দোষ নেই। আমরা যে ভয়ঙ্কর খেলায় হাত দিয়েছি তার ব্যর্থতা মানে সারা কশ্মীরের ব্যর্থতা, নিপীড়িত জনগণের পরাজয়। কিন্তু তা হতে দেওয়া যাবে না। শেখ আব্দুল্লার নেতৃত্বে আমরা একদিন স্বাধীন হবোই।

নারী আমি! স্বামী-সংসার আর অর্থ-প্রাচুর্যের মধ্যে নারী জীবনের সার্থকতা বলে আমাদের আজন্ম বিশ্বাস। মন তাই আমার মাসুদের প্রস্তাব আর পরিকল্পনার কথা শুনে মুষড়ে পড়ে। ভাবে, এ জন্যই কি তুমি মাসুদকে ভালবেসেছিলে? পিতামাতা, ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি বাদ দিয়ে তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিতে চেয়েছ, তোমার মতো গর্বিতা সাবধানী মেয়ের এতো বড় ভুল করা উচিত হয়নি। হিন্দু ব্রাহ্মণ কন্যা তুমি। যাকে একবার হৃদয় সিংহাসনে আসন দিয়েছ, যার জীবনের সার্থক সাথী হবার বাসনা অন্তরে পোষণ করেছ তার সহযোগিতায় তোমাকে এগিয়ে যেতেই হবে। পরিত্যাগ করলে চলবে না। ভয় পেয়েও লাভ নাই। অবহেলায় মুক্তি নেই। সে কিন্তু তোমাকে একান্ত ভাবে বিশ্বাস করেছে। গোপন কথা প্রকাশ ক'রে তার জীবনের চাবিকাঠি তোমার হাতে তুলে দিয়েছে। এ সরল বিশ্বাসের অমর্যাদা করো

না। তুমিও ঝাঁপিয়ে পড়ো। দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করো কাজ করে যাবার। তোমার যৌবন আছে, রূপ আছে, অভিনয় করার ক্ষমতা আছে, আর আছে অনুকূল পেশা।

: তবে কি আমিও স্পাই হবো? আমিও কি সেই গোপন সংস্থার অঙ্গিভুত হবো? পাল্টা প্রশ্ন করি আপন মনের কাছে।

: নিশ্চয়! সেই কথাই তো বলছি। মাসুদের বিপদ হয়তো ঘনিয়ে আসবে। তাকে হয় তো শত্রুপক্ষ সন্দেহ করবে। হয়তো হাসপাতাল থেকে তাকে সরিয়ে দেবে। তখন তোমাকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সমাপ্ত করতে হবে তার আরব্ধ কার্য।

: কিন্তু মাসুদের অভিসন্ধি যদি কার্যকর হয়, যদি তারা জয়লাভ করে তবে এখানকার হিন্দু অধিবাসীদের অবস্থা কেমন হবে? আমার আত্মীয়স্বজনদের পরিণতি কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে?

: ছিঃ ছিঃ! তুমি এতো সংকীর্ণ? এতো বড় কোপমণ্ডুপ! তুমি না ডাক্তার! পারবে তুমি একজন হিন্দুর বিলাসিতার জন্য মারাত্মক জখমগ্রস্ত একজন মুসলমান রোগীকে অবহেলা করতে? তার চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে?

মনের অগোচরে জবাব দেই: না, নিশ্চয় পারবো না। বলো, আমাকে কি করতে হবে? কোন পথে আমার দেশের নিষ্পেষিত মানবতার সাহায্যে নিজকে নিয়োজিত করতে পারবো আমি?

: তুমি যে পথে চলেছ ঐ পথেই পারবে। তোমার পেশা এবং কর্মপদ্ধতি অতিশয় উপযোগী দেশের মুক্তির জন্য।

আমার মনের সাথে বোঝাপড়ার কথা বললাম মাসুদকে।

আমার মনের অভিব্যক্তি শুনে মাসুদ যেন আশান্বিত হলো। সুন্দর চিকন ঠোঁটে তার বহিঃপ্রকাশ প্রতিভাত হলো। তার সে হাস্যোজ্জ্বল মৌনতা আমাকে আকৃষ্ট করলো তার প্রতি গভীরভাবে। নতুন করে যেন চিনলাম তাকে। সে ধীরে ধীরে বললো,—জানো দিন দিন আমরা কতো মারাত্মক ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আবিষ্ট হচ্ছি? দেশবাসীকে তাদের

অজান্তে কতো বড় বিপদের মধ্যে ঠেলে দিচ্ছি? ভারত সরকার চেয়েছিল আমাদের নির্ভীক নেতা শেখ আবদুল্লাহ আর মীর্জা আফজল বেগকে বন্দী করে জাগ্রত কাশ্মীরবাসীর প্রাণে ভয়ের সঞ্চার করতে। সংগ্রামের পথ থেকে তাদের সরিয়ে নিতে। কিন্তু তা কি পেরেছে? পেরেছে তাদের জাগ্রত সত্তাকে নিশ্চল করতে? পারেনি। পারবেও না। পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলও আমরা মুক্ত করবো। গঠন করবো স্বাধীন সার্বভৌম কাশ্মীর। আবদুল্লার বন্দীতে আজ জেগে উঠেছে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, নতুন করে শপথ নিয়েছে আত্মবিসর্জন দেওয়ার। দলে দলে কাশ্মীরী যুবক ভয় ভীতি আর জীবনের মায়া পরিত্যাগ করে নাম লেখাচ্ছে মুক্তি সেনাদের খাতায়। ঝাঁপিয়ে পড়ছে মুক্তি সংগ্রামে। জীবন দিয়েও তারা দেশ মাতৃকার জন্য আত্মনিয়োগ করতে চাচ্ছে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের অগণিত অনুপ্রবেশকারী।

—তোমার কথা শুনে আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে।

—ভয় নয়, বলো আনন্দ হচ্ছে।

—আনন্দ হচ্ছে? কেমন করে? দেশে মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হতে যাচ্ছে। বিপ্লবের আগুন ছড়াচ্ছে মুক্তি যোদ্ধারা। নতুন করে রক্তের বন্যা বহানোর ব্যবস্থা করছে তারা, আর তুমি বলছ আনন্দ করবো? —প্রশ্ন করলাম আমি। মাসুদ জবাবে বললো,—কাশ্মীরের একটা নিজস্ব সত্তা রয়েছে। কাশ্মীরবাসীও ভারত কিংবা পাকিস্তানের অধিবাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে চায় না। ভারতীয় উপমহাদেশ স্বাধীন হলেও কাশ্মীর সত্যিকার অর্থে স্বাধীন হয়নি। এর এক অংশ জোর করে দখল করেছে পাকিস্তান, আর এক অংশে প্রভাব বিস্তার করেছে ভারত। আমাদের নেতা শেখ আবদুল্লাহ এর কোনটাই পছন্দ করেন না। তিনি সাম্প্রদায়িক নন। তিনি কাশ্মীরকে যেমন পাকিস্তানের কাছে বিক্রি করতে চান না ভারতীয় অধিকার এখানে বজায় থাকুক সেটাও তাঁর কাম্য নয়। তাই তো ভারত

সরকার তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী করেছেন। তাই তো আমরা বিদ্রোহ করতে চাচ্ছি, সংগ্রামে লিপ্ত হচ্ছে কাশ্মীরের জোয়ান ছেলেরা।

—এটা পাকিস্তানের একটা দূরভিসন্ধি। প্রতিবাদ করলাম আমি।

—মিথ্যে কথা।

—তাহলে পাকিস্তান সরকার তাদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে কাশ্মীরীদের পাঠাচ্ছে কেন এখানে?

—তারাও ভুল করছে। পাকিস্তান মনে করেছে যেহেতু কাশ্মীরের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান সেহেতু ভারতীয় বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারলে কাশ্মীরবাসী পাকিস্তানে যোগদান করবে। কাশ্মীরও পাকিস্তান হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হবার নয়। আমাদের নেতা পাকিস্তানের সাথে কিছুতেই কাশ্মীরকে মিশিয়ে দিতে দেবেন না।

—তা হলে তাদের সাহায্য নিচ্ছ কেন তোমরা?

—আমাদের কার্যোদ্ধারের জন্য। একবার ভারত থেকে কাশ্মীরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার পরের সংগ্রাম হবে আমাদের পাকিস্তানের সাথে। তাদের নিকট থেকেও কেড়ে নেবো আমাদের অংশ। গড়ে তুলবো স্বাধীন সার্বভৌম কাশ্মীর।

—তোমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। দুটো বৃহৎ শক্তির সাথে সংগ্রাম করে টিকে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

—কেন নয়? আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। আমাদের দাবী স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার দাবী। সমগ্র বিশ্বের ন্যায়ানুগ মানুষ আমাদের প্রতি সমর্থন জানাবে। সাহায্য করবে সক্রিয়ভাবে।

—আমার বিশ্বাস হয় না।

—দেখে নিও, শেষ পর্যন্ত কী হয়। নিপীড়িত মানুষ স্বাধিকার আন্দোলনে একবার জেগে উঠলে কামিয়াব না হওয়া পর্যন্ত তারা থামে না।

—দেখা যাবে। নিস্পৃহের মতো শোনালো আমার কণ্ঠস্বর। মাসুদ আমার বলার ভঙ্গীতে একটু অসন্তুষ্ট হলো। কিছুটা উষ্মা প্রকাশ করে

বললো --বিশ্বাস না হয় আমার কথাগুলো লিখে রাখো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জোয়ানরা যেভাবে নিরাপরাধ মানুষের উপর অত্যাচার আরম্ভ করেছে তাতে শুধু মুক্তি সেনারা নয় সমগ্র কাশ্মীরের প্রতিটা নাগরিক অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হবে। ঝাঁপিয়ে পড়বে অত্যাচারী মিলিটারীদের উপর।

—কোথায় অত্যাচার করছে সামরিক বাহিনী? বরং মুক্তি সেনারাই ক্ষতিগ্রস্ত করছে তাদের দিনের পর দিন। বাধা দিয়ে বললাম আমি।

--তোমার সামনে কোনো অত্যাচার হচ্ছে না ঠিকই, কিন্তু পল্লী অঞ্চলে সীমান্ত এলাকার প্রতিটি জনপদে তারা শক্ত সামর্থ মানুষের উপর অত্যাচার করছে। সুন্দরী মহিলাদের ইজ্জত নিয়ে বেঁচে থাকাই এখন দুষ্কর হয়েছে।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি জোর করে তোমাকে বিশ্বাস করাতে চাই না। —বললো মাসুদ।

কিন্তু বিশ্বাস আমাকে করতেই হলো।

পরদিন ভোরে মিলিটারী ট্রাকে করে যে আহত রোগীগুলিকে আমাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল তার একজনও সামরিক বাহিনীর সদস্য ছিল না।

দুজন কলেজের ছাত্র, জন ত্রিশেক গ্রাম্য কৃষক আর একজন স্কুল শিক্ষিকা। তার মধ্যে স্কুল শিক্ষিকার অবস্থা ছিল শোচনীয়। তখনও তার গোপন অঙ্গ থেকে রক্ত নির্গত হচ্ছিল।

প্রাইমারী চিকিৎসার পর একজন অপেক্ষাকৃত কম আহত কলেজ ছাত্রের নিকট থেকে জানলাম: আমদানীকৃত সামরিক বাহিনীর লোকেরা অতর্কিতে গতকাল তাদের গ্রামে প্রবেশ করে বিনা কারণে কয়েকজন যুবকের উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়। সেই গ্রামে পাকিস্তানী অধিকৃত কাশ্মীর থেকে মুক্তি যোদ্ধারা ছদ্মবেশে আশ্রয় নিয়েছে বলে তারা গোপন খবর পেয়েছিল। বন্দী করেছিল কয়েকজনকে। বাধা পাওয়ায় ক্ষিপ্ত

হয়ে করেছিল তারা এই হত্যাযজ্ঞ। যুবকদল তাতে বাধা প্রদান করে। তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তখন ভয়ে অল্প সংখ্যক মিলিটারী প্রত্যাবর্তন করে। যাবার পথে, গ্রামের স্কুলটি তাদের চোখে পড়ে। চারজন মিলিটারী স্কুলগৃহে প্রবেশ ক'রে ছাত্র-ছাত্রীদের তাড়িয়ে দেয়। পুরুষ শিক্ষকদেরও ভয় দেখিয়ে বাধ্য করে সে স্থান পরিত্যাগ করতে। তারপর এই অবলা শিক্ষয়িত্রির উপর চালায় পাশবিক অত্যাচার। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন ভদ্র মহিলা। অবিশ্রান্ত ধারায় রক্তক্ষরণ হতে থাকে তার।

'এদিকে সংবাদ পেয়ে আমরা কয়েকজন যুবক ছাত্র সেখানে গমন করি। সে মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে আমাদের দেহের রক্ত টকবক করে ফুটে উঠে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা তাদের আক্রমণ করি। কিন্তু আমরা ছিলাম নিরস্ত্র। বেদম প্রহারে আমরাও সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।

সংবাদ চলে যায় সামরিক হেড কোয়ার্টারে। তাদের নেতা স্বচক্ষে আমাদের দুরবস্থা দেখে আমাদিগকে প্রেরণ করেন আপনাদের হাসপাতালে।"

নিষ্ঠুর পাপাত্মদের দৌরাত্মের কথা শুনে ও তাদের নৃশংসতা স্বচক্ষে দেখে আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। মনে মনে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলাম এর প্রতিশোধ গ্রহণের। নিরাপরাধ অবলা নারীর উপর অহেতুক অত্যাচার আমার চোখ খুলে দিলো। মনে পড়লো মাসুদের কথা। তার উদ্দেশ্যের কথা।

মাসুদ তখন আমার পার্শ্বেই দণ্ডায়মান ছিল। আমি তার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি মেলে বললাম, – তুমি আমাকে ঠিক কথাই বলেছ। আমাদের কর্তব্যে আমাদিগকে দৃঢ় হতে হবে।

মাসুদের চক্ষু দিয়ে তখন প্রতিহিংসার আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। সে আমার কথা শুনতে পেল বলে মনে হলো না।

গভীর রাত্রে মাসুদ একখানা কোরান শরীফ আর রামায়ন আমার হাতে উঠিয়ে দিয়ে সকল গোপনীয়তা জীবনের বিনিময়েও গোপন রাখার শপথ করালো। আমি সম্মোহিতের ন্যায় তার শপথ বাক্য পাঠ করলাম।

তাদের দলের একজন সক্রিয় সহযোগী হবার দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করলাম। মনে-প্রাণে মুক্তিযোদ্ধা বনে গেলাম। ভুলে গেলাম আমার পিতামাতার কথা। বিস্মৃত হলাম আমার ভবিষ্যৎ।

।। চার ।।

এখন আমি পুরাদস্তর স্পাই। মাসুদের চাইতেও সক্রিয়। আমাদের মুক্তি সংগ্রামীদের সাংকেতিক ভাষা আমার কণ্ঠস্থ।

অবশ্য সহজে তারা আমাকে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত করেনি। দস্তর মতো পরীক্ষা দিতে হয়েছিল আমাকে। কেমন করে তাই বলছি।

মাসুদ আমাকে পূর্বে কিছু বলেনি। গোধূলি লগ্নে সে নিয়ে গিয়েছিল আমাকে সেই দ্রাক্ষা ক্ষেতে। হয় তো আগেই সংবাদ প্রেরণ করেছিল তাদের সংস্থার নেতার কাছে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় এক ভিখারী হাজির হলো সেখানে। ধীরে ধীরে আমাদের কাছে এসে সে হাত পেতে ভিক্ষা চাইল। আমি তাড়াতাড়ি বিদায় দেওয়ার জন্য ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে পয়সা বের করলাম। হাত বাড়িয়ে দিতে গেলাম।

সে কিন্তু নিলো না। বললো,—আপনার ন্যায় সুন্দরী শিক্ষিত যুবতীর নিকট থেকে আমি অর্থ চাই না।

যুবক ভিখারীর ঔদ্ধত্য দেখে আমার আপদমস্তক জলে উঠলো। মনে হলো, একটা প্রচণ্ড আঘাতে তাকে ধরাশায়ী করি।

চোখ ফিরিয়ে তাকালাম মাসুদের দিকে। দেখলাম, সে দিব্বি নির্বিকার। ভিখারীর স্পর্ধা তার দেহ-মনে বিশেষ কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি। অভিমান হলো তার উপর আমার। বললাম,—বিদায় করো না তাকে।

—সে আমার কাছে তো কিছু চায়নি। তোমার কাছে কি চায় জিজ্ঞেস করেই দেখো না।

—না, ঐ অসভ্যটার সাথে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমিই জিজ্ঞেস করো।

মাসুদকে জিজ্ঞেস করতে হলো না। ভিখারীটি আপনা থেকেই বললো—আমি আপনার কাছে এমন এক দুর্লভ বস্তু চাই যা দেওয়ার জন্য আপনি ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি নিয়েছেন।

বলে কি অসভ্যটা! কোনো ভিখারীর এতো স্পর্ধা আগে তো আর কখনও দেখিনি? পাগল টাগল নয় তো? ছদ্মবেশী শয়তানও হতে পারে মুখে বললাম,—তুমি কিন্তু সীমা অতিক্রম করছ। দেখছ তো, আমি একা নই, আমার সঙ্গে একজন পুরুষও রয়েছেন। তিনি নিশ্চয় তোমার চাইতে বেশী শক্তি রাখেন।

আমার কথা শুনে বেহায়ার ন্যায় দাঁত মেলে হা হা করে হাসলো ভিখারীটি। বললো,—অপরের শক্তিতে নিজকে বলশালী বা নিরাপদ মনে করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আত্মশক্তিই সত্যিকার শক্তি। আত্ম প্রত্যয়ী আর কর্তব্যের প্রতি পূর্ণ আস্থাবান না হলে জীবনে কিছুই করা যায় না।

—কি বলতে চাও তুমি? বেশ বড় বড় কথা বলছ যে!

আবার হাসলো ভিখারীটি। বললো,—বড় কথা বলার জন্যই তো এতো বিপদ মাথায় করে আপনার কাছে এসেছি। এসেছি সক্রিয় সহযোগিতার আশ্বাস আর দেশাত্মবোধের পরীক্ষা নিতে!

এতক্ষণে মাসুদ আমার গা টিপলো। হেসে ফেললো সে। মুখে বললো, — তোমাদের পরিচয় করিয়ে দি। ইনি স্থানীয় সামরিক হাসপাতালের ভার প্রাপ্ত ডাক্তার। আর ইনি আমাদের কাশ্মীর মুক্তি সংস্থার অন্যতম নেতা শরীফ হোসেন। শরীফ ভাই বলেই পরিচিত।

শরীফ ভাইয়ের পরিচয় পেয়ে মন আনন্দে নেচে উঠলো। সসম্ভ্রমে আমি অভিবাদন জানালাম তাকে। তিনি বললেন,— বেশীক্ষণ এখানে বসে

আলাপ করা নিরাপদ নয়। শত্রু আমাদের সর্বত্র। সাবধানতার প্রয়োজন তাই সর্বক্ষণ। ডাক্তার বোন, আপনার পেশা যেমন মহৎ তেমনি ভয়ঙ্কর। আপনার মতো মেয়ের তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন! মাসুদের হাসপাতালে, বিশেষ করে একটি সুন্দরী মহিলার পরিচালনাধীন হাসপাতালে প্রথম পোস্টিং হওয়ায় আমরা প্রভূত উপকৃত হয়েছি। কিন্তু মনে রাখবেন শীগগীর হয় তো আপনাকে পরিপুর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করার ঝুঁকি নিতে হবে। মাসুদকে আর বেশীদিন তারা এখানে রাখবে না। সরিয়ে নেবে এখান থেকে। তখন ভয় পেলে চলবে না, বেদনায় মুষড়ে পড়লেও উপায় থাকবে না। মনে রাখবেন, তখনই সত্যিকার দায়িত্ব বর্তাবে আপনার উপরে।

পাশের গ্রামে একটা চির রোগীকে আমদানি করবো আমরা। প্রয়োজন হলে, বিশেষ করে যখন হাসপাতাল থেকে সংবাদ আদান প্রদান করা নিরাপদ নয় মনে হবে তখন আপনাকে আহবান করা হবে সেই রোগীকে চিকিৎসা করানোর জন্য।

সেখানেই আমাদের প্রতিনিধিকে পেয়ে যাবেন আপনি। ইংরেজী এম. অক্ষরটা ব্যবহার ক'রে যদি কেউ প্রথম আলাপ করে তবে বুঝবেন সে আমাদের দলের লোক। সেই আপনার সত্যিকার বন্ধু।

আমি শরীফ ভাইকে বাধা দিয়ে বললাম,—আমাদের আপাতত কর্তব্য কি?

—নিপীড়িত দেশবাসী জেগে উঠেছে। দুর্বার হয়েছে তাদের সংগ্রামী মনোভাব। মরিয়া হয়ে উঠেছে তারা। সাদিক সরকার তা বুঝতে পেরে হাজার হাজার পুলিশ আর কয়েক ডিভিশন সৈন্য আমদানি করেছে কাশ্মীরে। অত্যাচার আর উৎপীড়ন করে তারা মুক্তি পাগল দেশবাসীকে জব্দ করতে আরম্ভ করেছে। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী হিসেবে বন্দী আর হত্যা করছে অগণিত যুবক-ছাত্রকে। আমরা তাই শপথ নিয়েছি সন্ত্রাস চালিয়ে যাওয়ার। সামরিক বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করার। পূর্ব থেকে সর্বত্র মাইন আর বোমা রেখে দেওয়া সম্ভব নয়।

নিরাপদও নয়। তাতে আমাদের দেশবাসীরও যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। পাকিস্তান সরকার এখন আমাদের সাহায্য করছে। কিন্তু তারা জানে না যে, তাদের অধিকারে কাশ্মীরের যে অংশটুকু রয়েছে সেটুকুও আমরা উদ্ধার করতে চাই।

—আমি কি করবো তা তো বললেন না। শরীফ ভাইকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আপনার কর্তব্য হলো, যে কোনো উপায়ে মিলিটারীদের গতি-বিধির সংবাদ সংগ্রহ করা আর তা যথা সময়ে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে পৌঁছে দেওয়া। তাদের খাদ্য বোঝাই গাড়ী ও সাজোয়া বাহিনী যখন কোনো নতুন ঘাটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে তখন তাদের নির্দিষ্ট গতি পথের সন্ধান আপনাকে সংগ্রহ করতে হবে।

—তা হয় তো পারবো। কিন্তু পৌঁছে দেবো কিভাবে?

—প্রথম দিকে মাসুদ এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করবে, তার বদলীর পর আমাদের লোকই আপনার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করবে।

—একটা ট্রান্সমিটার আমাকে দিতে পারেন না কি?

—না, তাতে বিপদের সম্ভাবনা বেশী। কাজ আদায় করার জন্য অনেক সময় নেপালের সামরিক অফিসারদিগকে আপনার কক্ষে অনুপ্রবেশের অনুমতি দিতে হবে। সে সময় তারা ওটা দেখতে পাবে। ফলে ধরা পড়ার ভয় থাকবে। আপনাকে একটা কোড ল্যাংগুয়েজের কাগজ দিচ্ছি। মুখস্থ করেই তা পুড়িয়ে ফেলবেন। ভালো করে মুখস্থ করে নেবেন। ছাইটাও নষ্ট করে ফেলবেন। মনে রাখবেন, আপনার সামান্য গাফলতি আমাদের বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারবে। আর আপনি যদি কোনো কারণে বিশ্বাসঘাতকতা করেন, আপনার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে গাফলতি করেন তবে আমাদের বিপ্লবী কর্মীরা আপনাকে নির্বিধায় হত্যা করবে। আপনার পরিবারটিকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। দলের বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে হত্যা করাই বিপ্লবীদের প্রাথমিক কর্তব্য।

রাত বেশী হয়ে গিয়েছিল। কাগজখানা নিয়ে ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বিদায় নিলাম তাই। মাসুদ কয়েকটি ছোট বোমা নিলো শরীফ ভাইয়ের নিকট থেকে।

আমার প্রথম শিকারে পরিণত হলো বেচারা করণ সিং। প্রথম দর্শন থেকেই তিনি আমার রূপের মোহে আবিষ্ট হয়েছিলেন। পতঙ্গের ন্যায় মরণ খেলায় মেতে উঠেছিলেন তিনি। সময় অসময় ছোট খাট অজুহাতে চলে আসতেন হাসপাতালে। সঙ্গোপনে উপভোগ করতেন আমার মধুর সাহচর্য। কামনা করতেন আমার দেহ সম্ভোগ। কিন্তু আমার দৃঢ়তা দৃষ্টে সাহসী হতেন না তিনি। সরাসরি প্রস্তাবও করতে পারতেন না।

এই সুযোগে আমি তাকে খেলাতাম! একটু হাসি, একটুখানি সহৃদয়তা কিংবা সামান্যতম প্রেমাভিনয় তাকে মাতাল করে তুলতো। তিনি রাত্রে আমাকে সিনেমায় যাবার প্রস্তাব দিতেন। হাসপাতালের আহত রোগীদের শুশ্রূষার অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমা চাইতাম। সে অজুহাত তার ভালো লাগতো না। দু এক সময় অভিমান করে বলতেন,—আমার চাইতেও রোগীদের বেশী ভালবাসেন নাকি?

মৃদু হেসে বলতাম,—তা ঠিক নয়। ভালো আমি আপনাকেই বাসি তবে আপনার চাইতে ভালবাসি আমার পেশাকে, আমার কর্তব্যকে। জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা উচিত নয়।

—নার্স রয়েছে তো! বিরক্ত হয়ে বলতেন তিনি। জবাবে বলতাম আমি,—ডাক্তারের কাজ যদি নার্স দিয়ে হতো তবে গভর্নমেন্ট এতো বেশী বেতন দিয়ে আমাকে রাখতো না।

—বড় দুষ্টু মেয়ে আপনি। —অনুযোগ করতেন তিনি।

—দুষ্টু কি আমি? ঘরে বিবি থাকতে আমাকে নিয়ে সিনেমা দেখা কেন? তাকে সঙ্গে আনতে পারেন না?

আমার জবাব শুনে উচ্চৈঃস্বরে হাসতেন তিনি। দু দিন পরে আবার আসার ওয়াদা দিয়ে বিদায় নিতেন। আমি হাসতাম তার

বেহায়পনা দেখে। মনে মনে বলতাম, ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি!

মাসুদকে বলতাম সব কথা অকপটে। সে কিছু মনে করতো না। আমার উপর তার অস্বাভাবিক বিশ্বাস ছিল। সে বরং বলতো, — যে-কোনো উপায়ে গোপন খবর বের করা চাই। ওদের ট্রুপটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাই তৃতীয়বার যাত্রার সময়। তারা ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করেছে দেশবাসীর উপর। এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারলে আমাদের স্বস্তি নেই - শান্তি নেই।

—করণ সিং যেমন পাগল হয়েছে তাতে তার নিকট থেকে গোপন পরিকল্পনার খবর বের করা খুব শক্ত হবে না। বললাম মাসুদকে।

কি জানি কেন করণ সিং কয়েকদিন আর হাসপাতালে আসলেন না। মনে হলো, তারা নতুন কোনো সীমান্ত ঘাঁটিতে হয় তো চলে গেছেন। শিকার হাতছাড়া হয়েছে মনে করে বড় খারাপ লাগতে লাগলো। মাসুদও তার দুধওয়ালার মারফতে গোপন খবর সংগ্রহ করার চেষ্টা করলো, কিন্তু কোনো সঠিক খবর সংগ্রহ করতে পারলো না। অবশেষে এক গভীর রাত্রে মাসুদ তার ট্রান্সমিটার চালু করলো। জানতে চাইল মেজর জেনারেল করণ সিংহের ট্রুপের গতিবিধির কথা।

অপর কেন্দ্র থেকে বলা হলো, — তারা এখনও পূর্বের শিবিরে অবস্থান করছে। তবে অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে শীগগীর তারা অন্যত্র যাত্রা করবে। কোন তারিখে কয়টার সময় তারা কোন পথে যাত্রা করবে জানতে না পারলে তাদের ক্ষতি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আমাদের গোপন বাহিনী তো আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ না করে তারা ক্ষান্ত হবে না। আমরা প্রস্তুত হয়েই রয়েছি।

মাসুদ জানালো,— প্রস্তুত হয়েই থেকো। যে কোনো সময় সংবাদ প্রেরিত হতে পারে। তবে মনে রাখবে, হয় তো শেষ মুহূর্তে যাবে সে সংবাদ। কাজ করতে হবে দ্রুততার সাথে।

— চারিদিকেই আমাদের লোক নিয়োজিত রয়েছে। শুধু আদেশের অপেক্ষা।

লাইন কাট হয়ে গেল। বেশীক্ষণ কথা বলা নিরাপদ ছিল না।

অতিবাহিত হলো আরও দুদিন। করণ সিং তবু এলেন না। বুঝলাম ভুল সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে। তারা নিশ্চয় চলে গেছে অন্যত্র। নয় অন্ততঃ শেষ চেষ্টা করার জন্য হলেও একবার আসতেন করণ সিং আমার কাছে।

অবশেষে হতাশ হয়ে মাসুদকে নিয়ে বেশ কয়েকদিন পরে আবার সান্ধ্য বিহারে গেলাম সেই আমাদের বহু পরিচিত দ্রাক্ষাক্ষেতে। মনের আনন্দে অতিবাহিত করলাম বেশ কয়েক ঘন্টা। প্রাণ উজাড় করা গল্প করলাম দুজনে আর পরিকল্পনা করলাম, করণ সিং যদি সত্যিই আসে তবে যে-কোনো উপায়ে তার নিকট থেকে প্রথমে আদায় করতে হবে তাদের গন্তব্য পথের হদিস, তারপর নির্মমভাবে হত্যা করতে হবে তাকে। স্থির হলো, আমি তাকে আমার কক্ষে চাতুর্যময় অভিনয়ের মাধ্যমে আটকে রাখবো অন্ততঃ দুটো ঘণ্টা। সেই অবসরে সুযোগ মতো মাসুদ গুপ্তভাবে টাইম বোমা ফিট করবে তার গাড়ীর ইঞ্জিনের মধ্যে। মনের আনন্দে গভীর রাত্রে ব্যস্ততার মধ্যে স্টার্ট দিতে যেয়েই মরণ বিপদ ডেকে আনবে সে। বাস্ট হয়ে যাবে বোমা আর প্রচণ্ড আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হবে তার দেহ। চিরতরে সাধ মিটবে তার পরস্ত্রী সম্ভোগের। ওদিকেও নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করা হবে তার সাজোয়া বাহিনীকে।

রাত দশটার পরে অভিসার সমাপ্ত ক'রে আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম হাসপাতালে। মন তখন আমার আনন্দে প্রজাপতির ন্যায় নেচে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু গাড়ী বারান্দায় প্রবেশ করেই আত্মা আমার কেঁপে উঠলো। মাসুদের মুখমণ্ডলও রক্তশূন্য হলো। নিশ্চল পাথরের মতো সে আমার পার্শ্বে বসে রইল।

গাড়ী দেখে আমাদের বুঝতে কষ্ট হলো না যে, করণ সিং এসেছেন হাসপাতালে। বহুক্ষণ অপেক্ষা করছেন অধৈর্যের সঙ্গে। মাসুদের সাথে

আমার অভিযোগ তার মনঃপুত নয়। তাকে হয়তো কোর্ট মার্শালে দেওয়া হবে—আমার উপর চলবে অত্যাচার। তাকে উপেক্ষা করে তারই অধীনস্থ অফিসারের সাথে গোপন মাখামাখি করার সাধ আমাকে মিটিয়ে দেবেন করণ সিং।

খোদার কাছে বুদ্ধি প্রার্থনা করলাম।

আমাদের গাড়ীর শব্দ শুনে করণ সিং বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। রক্তজবা চোখ দিয়ে তার তখন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছিল। মনে হচ্ছিল যেন আমাদের গিলে খেতে পারলেই তিনি খুশী হন।

ধীরে ধীর নামলাম গাড়ী থেকে। মৃদু হাস্যে শুধালাম —কেমন আছেন স্যার? ডুমুরের ফুল হয়েছেন দেখছি। সেই যে গেলেন আর আমার নাম নেই! আমি এদিকে ভেবে ভেবে সারা! একটা খবরও তো দেওয়া যেত!

আমার আন্তরিকতাময় অভিনয়ে কোনো কাজ হলো না। টুশব্দটি করলেন না করণ সিং। মাসুদ গাড়ী থেকে নেবে মিলিটারি কায়দায় তাকে অভিবাদন জানালো—তারও জবাব পাওয়া গেল না করণ সিংহের পক্ষ থেকে।

এক মিনিটেই কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। তাকে অতিক্রম করে উঠে গেলাম বারান্দায়। করণ সিংহের পিছন থেকে ঈশারা করে বললাম মাসুদকে, প্রতিশোধ গ্রহণ করতেই হবে। কার্যকর করতে হবে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা। এই মস্ত সুযোগ।

মাসুদও বারান্দায় উঠে এলো। পাশ কেটে চলে যেতেই বাজখাই কণ্ঠে করণ সিং তাকে জিজ্ঞেস করলেন,—লেডি ডাক্তারের সাথে আড্ডা মারার জন্য তোমাকে এখানে নিয়োগ করা হয়েছে না কি? বিকেল থেকে খোঁজ নিয়েছ তুমি আহত জোয়ানদের?

নিশ্চুপ থাকলো মাসুদ।

করণ সিং আবার রুক্ষ মেজাজে বললেন,—রাত্রেই আমি হেড কোয়ার্টারে তোমার নষ্টামীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করবো। কালই তোমাকে

পরিত্যাগ করতে হবে হাসপাতাল। হাসপাতালে চাকরি করতে এসে ডাক্তারের সঙ্গে অভিসার করার সাধ তোমার মিটিয়ে তবে ছাড়বো।

মাসুদ তখনও নিরুত্তর। আমি আমার অফিস রুম থেকে শুনতে পেলাম —যাও, গুছিয়ে নাও। গাধার মতো এখানে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? পরনারীর সাথে তিন ঘণ্টা আড্ডা জমিয়েও সাধ মিটেনি? কালই মিটিয়ে দেবো।

মাসুদ বোধ হয় চলে গেল তার কক্ষাভিমুখে। খট খট করে পা ফেলে করণ সিং প্রবেশ করলেন আমার অফিস ঘরে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম তার ব্যবহারের অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ্য করে। বেশ শান্ত মনে হলো তাকে।

বাথ রুম থেকে ফিরে এসে দেখি হাতের ছোট্ট ছড়িটা টেবিলের উপর রেখে মেজর জেনারেল করণ সিং নিবিষ্ট চিত্তে দেয়ালে ঝুলন্ত আমার ফটোটার দিকে তাকিয়ে আছেন।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, —কি ব্যাপার! কয়েকদিন যে কোনো পাত্তাই নাই! অসুখ-বিসুখ হয়নি তো?

—আমার অসুখ হলে আপনার কি এসে যায়?

—বলেন কি? আমাকে এতো পর মনে করেন আপনি? —স্মিত হাস্যে শুধালাম আমি।

আমার সে কথায় কোন যাদু ছিল জানি না। কঠিন পাথরের মধ্য থেকে ঝরণা ধারা নেমে এলো যেন। চেয়ারটা আমার পাশে সরিয়ে এনে বললেন তিনি—সত্যিই কি তাই? সত্যিই আপনি কি আমাকে ভালবাসেন?

—সন্দেহ হয় নাকি? - একেবারে ধরা দিলাম যেন আমি। এবার আমার নরম ডান হাতখানা তার শক্ত হাতের মধ্যে নিয়ে সোহাগ দেখিয়ে বললেন,—এ কথা এতোদিন বলোনি কেন লক্ষ্মীটি? আমি তোমাকে নিয়ে মনে মনে কতো জাল বুনেছি। কতোদিন কতো আশা আর পরিকল্পা করেছি, তা কি তুমি জানো? তোমার চোখের কঠোর শাসনের নীচে চাপা

পড়ে গেছে আমার সব রকম সাধ সাহস পাইনি সরাসরি প্রস্তাব করতে।

—ঠিক আছে, সময় তো চলে যায়নি! এখনও ঢের সময় পাওয়া যাবে।

—না, মিস মীরা, আর সময় নেই। আজকের রাতটাই মাত্র আমার হাতে। আগামীকাল সকালে আমাদের যাত্রা করতে হবে আবার সীমান্তের দিকে। হেড কোয়ার্টার থেকে আদেশ এসেছে গুল-তারি সেক্টরে যাওয়ার জন্য। সেখান থেকে আক্রমণ চালাতে হবে পাকিস্তানের কারগিল ফাঁড়িতে।

—কেন, পাকিস্তান কি উস্কানীমূলক কিছু করেছে?

—হ্যাঁ, তারা বিপুল পরিমাণ সৈন্য আমদানী করেছে সেখানে।

—তা হলে তো ভারি ভয়ের কথা।

—না, কি আর ভয়! তিন দিনেই সমস্ত পাক-অধিকৃত কাশ্মীর দখল করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য নয়। ওরা একটা গুলী করলে আমরা এগিয়ে যাবো সামনে। আজ আমাদের বিদায়ের দিন, তাই এলাম তোমার কাছে। আমাকে শান্তি দান করতেই হবে লক্ষীটি।

প্রেম নিবেদনে বিগলিত হলেন মেজর করণ সিং। আমি আমার গোপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য বললাম, কতো পথ এখান থেকে বর্ডার?

—মাইল বিশেক হবে।

—কোন পথে যাবেন আপনারা?

—কেন, জানখেলের সোজা সড়ক দিয়েই যাবো আমরা? গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে ছোট পথে যাওয়া যায় না।

—সকাল কয়টায় যেন যাত্রা করবেন আপনারা? জিজ্ঞেস করলাম আবার।

ভোর সাতটায় যাত্রা আরম্ভ হবে আমাদের।

এরপর আর তার সম্মুখে বসে থাকা নিরাপদ বলে মনে হলো না আমার। দু'মিনিটের জন্য তার নিকট থেকে ছুটি নিয়ে প্রবেশ করলাম খোলা বাথরুমে। বন্ধ করে দিলাম চলন্ত টেপ রেকর্ডার মেশিন। গোপন স্থানে সযত্নে রেখে দিলাম সেটা। ফিরে এলাম আবার মেজর করণ সিংহের কাছে। তার কথাগুলি রেকর্ডকৃত হয়ে গেছে।

প্রেমাভিনয় আমাদের বেশ জমে উঠলো। করণ সিং কিছুটা আশান্বিত হয়ে পড়লেন। তিনি তার হাতদুটো আমার দুই গণ্ডে স্থাপন করে যেই চুম্বন করতে যাবেন অমনি পর্দা ঠেলে প্রবেশ ঢুকলো একজন নার্স। ব্যস্ততার সাথে বললো,—রাত বারোটা বেজে গেছে ম্যাডাম। আপনার এখনও খাওয়া হয়নি। দারোয়ান মেইন গেট বন্ধ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

নার্সের অকস্মাৎ প্রবেশে খোদা রক্ষা করলো আমাকে কিন্তু মেজর করণ সিং সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন,—ঠিক আছে। চারদিন পরে আবার আমি বর্ডার থেকে তোমার কাছে আসবো। ঐদিন রোববার। সারাদিন থাকবো কিন্তু।

—নিশ্চয়! আমারও তো সেদিন ছুটি। সিনেমায় যাওয়া যাবে একত্রে।

খুশী হলেন করণ সিং। হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। নার্সের সমমুখে আমি আর শেখহ্যাণ্ড করলাম না। করজোড়ে নমস্কার করলাম তাকে। মনে মনে বললাম,—রোববার আর তোমার জীবনে আসবে না।

আনন্দিত চিত্তে নিষ্ক্রান্ত হলেন করণ সিং আমার কক্ষ থেকে। বারান্দা পর্যন্ত অনুগমন করলাম আমি।

ভাবলাম, আমার কার্য আমি সঠিকভাবে সমাধান করতে পেরেছি। মাসুদ কি করেছে খোদাই জানে।

গাড়ীতে হেড লাইট জ্বালিয়ে শেষ বারের মতো বিদায় নিলেন করণ সিং। বড় হাস্যোজ্জ্বল দেখালো তাকে। স্টার্ট দিয়ে দ্রুত গতিতে হাসপাতালের গেট অতিক্রম করলেন তিনি। ধীরে ধীরে মাসুদ এসে দাঁড়ালো আমার পশ্চাতে। তার সাড়া পেয়ে পিছন ফিরলাম আমি। চার চক্ষুর মিলন হলো আমাদের। ঈশারায় তাকে জিজ্ঞেস করতে যাবো এমন সময় একটা বিকট শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হলো। বুঝতে পারলাম সবকিছু। ছুটে গেলাম অকুস্থলে।

সেখানে গিয়ে সে বীভৎস কাণ্ড দেখে দয়া হলো আমার। মেজর

করণ সিংহের গাড়ীটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। প্রাণহীন দেহটাও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পড়ে রয়েছে পাশে।

এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো সেখানে।

হাসপাতালের গাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হলো মিলিটারী ক্যাম্পে। তারা তখন পরবর্তী দিনের যাত্রার জন্য ব্যতিব্যস্ত। তাদের কয়েকজন অফিসার তবু এলেন ঘটনাস্থলে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তদন্ত—তদারক করলেন অনেকক্ষণ ধরে। কোনো কূল কিনারা পাওয়া গেল না। তারা ভাবলেন, মুক্তি বাহিনীর কোনো সদস্য চলন্ত গাড়ীতে বোমা নিক্ষেপ করে সরে পড়েছে।

মেজর করণ সিংহের দেহ হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলেন তারা। কয়েক ঘণ্টা পরেই যাত্রা করতে হবে তাদের পাকিস্তানী সীমান্তের দিকে।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। আমার প্রথম এ্যাটেম্পট কৃতকার্যতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে দেখে এক পাশবিক আনন্দ অনুভব করলাম সারা দেহ-মনে।

সুযোগ মতো টেপ রেকর্ডার মেশিনটি দিয়ে এলাম মাসুদের করে। যথাস্থানে সংবাদ প্রেরণের দায়িত্ব অর্পিত হলো তার স্কন্ধে।

অবশিষ্ট রজনীটুকু অনিদ্রায় অতিবাহিত হলো আমার। বেচারা করণ সিংহের কথা বার বার মনের আকাশে উঁকি মারতে লাগলো।

সারাদিন কোনো সংবাদ পেলাম না। পরদিন সকালে কাগজ খুলেই শিউরে উঠলাম। বড় বড় হেড লাইনে প্রথম পৃষ্ঠাতেই ছাপা হয়েছে: ৪৫ ডিভিশন পদাতিক বাহিনী ও ৯ ডিভিশন সাজোয়া বাহিনী তাদের গন্তব্য পথে যাবার বেলায় শেরপুর পুলে গিয়ে সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরা উক্ত বিরাট পুলের নীচে পূর্বাহ্নে টাইম বোমা রেখে দিয়েছিল। পুলটাও বোমার আঘাতে আগুন ধরে যাবার ফলে সব কিছু বিনষ্ট হয়েছে। কিছু সংখ্যক সৈন্য অবশ্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছে তবে হতাহত হয়েছে বেশীর ভাগ।

ঘটনাস্থলে দ্রুত তদন্ত কমিটির সদস্য এবং মেডিকেল সাহায্য প্রেরিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক অনুপ্রবেশকারীকে বন্দী করা সম্ভব হয়েছে।

সংবাদটা পড়ে আমার মনে হলো,—এ কী হচ্ছে? এমনি ভাবে মিলিটারীদের ক্ষয়ক্ষতি করার অর্থ সমগ্র কাশ্মীরকে নতুন করে বারুদের মুখে ঠেলে দেওয়া। দেশব্যাপী ভয়াবহ যুদ্ধের সূত্রপাত করা। নিরীহ সামরিক বাহিনীর লোককে হত্যা করে লাভ কী? তাতে ভারত সরকারের নীতি পরিবর্তন হবে বলে মনে হয় না। কাশ্মীরেরও কোনো লাভ হবে না। শান্তি আলোচনার মাধ্যমে কোনো মীমাংসা হলে সেটাই হতো দেশের জন্য সত্যিকার মঙ্গল।

।। পাঁচ ।।

আর একদিনের ঘটনার কথা বলি।

ইতিমধ্যে আমাদের হাসপাতালের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমার উপর একজন সিনিয়র পুরুষ ডাক্তারকে চাপানো হয়েছে। সহকারী নার্সের সংখ্যাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। আহত সৈনিকের আমদানীতে বেড সংখ্যা বেড়েছে আশাতীতভাবে।

আর সবচাইতে মারাত্মক ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে আমার। সে হলো আমার প্রিয় মাসুদের বদলী। আপাততঃ তাকে দেওয়া হয়েছে সীমান্তের আর একটা হাসপাতালে। সেখান থেকে তাকে কোথায় দেওয়া হবে—তার ভয়াবহ গোপন কর্তব্য সমাপন করতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে তবে তার পরিণতি কী হবে সব কিছুই ছিল আমার অজানা। আমার ভবিষ্যৎও হয়ে পড়লো তাই অনিশ্চিত।

যাবার সময় মাসুদ বলেছিল,—যদি প্রাণে বেঁচে থাকি আর স্বাধীন হতে পারি তবে আমাদের মিলন হবেই। তুমি সাবধান থাকবে। নিরাশ হবে না কিছুতেই। হৃদয়ে সব সময় বল রাখবে। মনে করবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত। অকালে মরলে চলবে না।

জবাবে বলেছিলাম,—আমাদের সত্যিকার পরিচয় খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমাকে রক্ষা করা, সকল বিপদাপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করাই তোমার কর্তব্য। যেখানে যে অবস্থায় থাকো না কেন, আমার সন্ধান নেবে। তুমি যদি শেষ পর্যন্ত চাকরি ছেড়ে চলে যাও তবে আমাকেও নেওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমাকে পরিত্যাগ করো না যেন। তবে মনে রাখবে, দু'বছরের বেশী সময় আমি তোমাকে দেবো না।

যাক সে কথা। আমাদের ব্যক্তিগত কথা বলে লাভ নেই। যে দিনের ঘটনার কথা বলতে চাচ্ছিলাম তাই বলি।

বিকেলে কোনো কাজ ছিল না। আমার নতুন বস্ বৃদ্ধ ডাক্তার ঘোষলার সাথে বসে গল্প করছিলাম। হাসপাতালের উত্তর পার্শ্বের বিস্তীর্ণ ময়দানের এক দিকে দুটো চেয়ারে বসে ছিলাম আমরা। সন্ধ্যা আগত প্রায়। সূর্য অস্ত গেছে—গোধূলি লগ্নও নিঃশেষ প্রায়। এমন সময় দুজন অর্ধবয়সী গ্রামবাসী আমাদের সম্মুখে এসে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। আমরা ডাক্তার হলেও তাদের এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ডাক্তার সাহেব তাদের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—কি হয়েছে তোমাদের? কাঁদছো কেন?

—আমাদের সর্বনাশ হয়েছে হুজুর। আমার স্ত্রী আজ দুদিন থেকে ভয়ানক প্রসব বেদনায় অস্থির। কতো কি করলাম স্যার, কিছুতেই কিছু হলো না। এখন আর কোনো উপায় নেই হুজুর। এদিকে কোনো ডাক্তার নেই। লেডী ডাক্তার যদি একবার না যান তা হলে হুজুর আমার কপালে আগুন লাগবে। তিনটে ছেলেমেয়ে মা অভাবে মারা যাবে। হুজুর আমাকে রক্ষা করুন।

—এটা তো সামরিক হাসপাতাল। বাইরে রোগী দেখার অধিকার নেই আমাদের।—বললেন ডাক্তার ঘোষাল।

—সে আমরা জানি হুজুর। সাধারণ অসুখে তাই আমরা আসি না। কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না স্যার। আমাদের এম. শেখ মানে

গ্রামের মোড়ল বললেন,—ডাক্তার সাহেবকে গিয়ে কান্নাকাটি করে বলো তা হলে লেডী ডাক্তার' আসবেন। তিনি তো আরও কয়েকবার এসেছেন আমাদের বিপদের সময়।

লোকটির মুখে ইংরেজী 'এম' শব্দটা শুনেই আমি মুহূর্তে সব অনুধাবন করতে পারলাম। বললাম,—হাঁ স্যার ইতিপূর্বে গিয়েছি কয়েকবার। ওরা খুব সরল, সামান্যতেই খুশী হয়। উপকার করলে জন্ম জন্মান্তরে গোলাম হয়ে থাকে।

—কিন্তু রাত হয়ে গেল যে।

—তাতে কিছু এসে যাবে না। এ অঞ্চল আমার সব চেনা হয়ে গেছে। আগে প্রায়ই তো বিকেলে বের হতাম ওদিকে।

—ড্রাইভার যাবে তো?

—ড্রাইভার আমার লাগবে না। আমি নিজেই ড্রাইভ করতে পারি।

- তাই নাকি? বেশ বেশ। যাও তাড়াতাড়ি যাও। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র নেবে কিন্তু।

—সে আর বলতে হবে না।

গ্রামবাসীদের গাড়ীতে উঠিয়ে নিলাম। একটা গোপন আস্তানায় আমাকে নিয়ে গেল তারা। দেখা হলো সেখানে আবার শরীফ ভাই-য়ের সাথে। প্রথমেই তিনি বললেন,- মাসুদ ভালো আছে। আপ-নাকে চিন্তা করতে নিষেধ করেছে।

—এজন্যই কি ডাকিয়েছেন?

—না আরও সংবাদ আছে। শুনলাম শ্রীনগরে আবার নতুন করে ভারতীয় মিলিটারী আমদানী হয়েছে, এবার কোনো একদিন গভীর রাত্রে তারা ট্রেনে করে বর্ডার অভিমুখে যাত্রা করবে। একটা স্পেশাল ট্রেনে যাবে তারা। বিপুল পরিমাণে গোলাবারুদও থাকবে সে ট্রেনে। এক সপ্তার মধ্যেই তারা পাস করবে এই স্টেশন। আমরা ভুল করেও একজন সিভিলিয়ানকে মারতে চাইনা। আমরা জানতে চাই শুধু সঠিক সময়টি। যে কোনো উপায়ে সংবাদটি সংগ্রহ করে এদের যে কোনো

একজনের মারফত পৌঁছে দিতে হবে। এরা রোগীর সংবাদ দেওয়ার নাম করে আপনার কাছে যাবে।

সেখানে বেশীক্ষণ থাকা নিরাপদ মনে করলাম না। বেরিয়ে পড়লাম হাসপাতালের উদ্দেশ্যে। আসার সময় শুধু বলে আসলাম —আমার চেষ্টার ত্রুটি হবে না।

ডাক্তার ঘোষলা আমার প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। গাড়ীর শব্দ শুনেই বেরিয়ে এসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন,— রোগী কেমন আছে?

মনে মনে বললাম: রোগী তো ভালই আছে তবে শেষ রক্ষা হলে হয়। মুখে বললাম, — রোগীর অবস্থা সত্যই খারাপ ছিল, তবে খোদার মেহেরবানীতে কৃতকার্য হয়েছি। শিশুটাকে বাঁচানো গেল না। কিন্তু রেগীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

—যাক, স্থানীয় লোকেরা আমাদের উপর আস্থা রেখেছে এই যথেষ্ট। গ্রাম্য অশিক্ষিতরা সাধারণতঃ ডাক্তার ডেকে ডেলিভারী করাতে চায় না। অধর্ম মনে করে।

—ঠিকই! মারাত্মক না হলে শেষ পর্যন্ত আসতও না।

ডাক্তার ঘোষালার নিকট থেকে বিদায় নিয়ে আপন কক্ষে গমন করলাম। দুশ্চিন্তায় সারা রাত ঘুম হলো না। কি করে রেল স্টেশন থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করবো তাই নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলাম। কোনো কূল কিনারা পেলাম না।

কিন্তু খোদা সুযোগ জুটিয়ে দিলেন একদিন পরেই। শ্রীনগর থেকে ডাক্তার ঘোষলার স্ত্রী টেলিগ্রাম করলেন তাকে সেখানে যাওয়ার জন্য।

সারাদিন ধরে ডাক্তার সাহেব সামরিক হেড কোয়ার্টারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে ছুটি মনজুর করালেন। পাঁচ দিনের জন্য তিনি শ্রীনগরে যেতে চাইলেন।

বিকেল সাড়ে ছয়টায় ছিল তার শ্রীনগর যাবার ট্রেন। ড্রাইভারকে সঙ্গে নিতে দিলাম না। আমি তাকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিলাম। ডাক্তার সাহেব তাতে বরং খুশীই হলেন।

সাড়ে পাঁচটার পরই যাত্রা করলাম আমরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে। দশ মিনিটে পৌঁছে গেলাম সেখানে। একটা রেষ্টুরেন্টে বসে চা পান করলাম দুজনে।

ডাক্তার সাহেব টিকেট বিক্রেতার কাছে না গিয়ে সোজা চললেন স্টেশন মাষ্টারের রুমে। মাস্টার সাহেব সজ্জন—তবে বেশ চঞ্চল। কথা বলেন একটু বেশী। আমাদের পরিচয় পেয়ে খুব খুশী হলেন বলে মনে হলো। আমার উপস্থিতি যেন তাকে আরও বেশী চঞ্চল করে তুললো। তার মানসিক উত্তেজনা ও অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে মনে হলো এ ব্যক্তিটির নিকট থেকে কার্য উদ্ধার করা খুব কঠিন হবে না। একটা টোপ দিলেই হবে।

ট্রেন আসার ঘন্টা বেজে উঠলো। মাস্টার সাহেবসহ আমরা চলে এলাম বাইরে। মাস্টার সাহেব নিজেই ডাক্তার সাহেবের জন্য টিকেট নিয়ে এলেন। ডাক্তার সাহেবের পক্ষ থেকে আমিই তাকে সহাস্য ধন্যবাদ জানালাম।

আর যায় কোথায়? আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন যেন তিনি। চল্লিশ বছরের ভদ্রলোককে মনে হলো ছেলে মানুষ। বার বার পাল্টা ধন্যবাদ জানালেন আমাকে।

ট্রেন প্লাটফর্মে এলো। চলেও গেল। নিয়ে গেল ডাক্তার সাহেবকে। তার পর আমি সৌজন্যমূলক বিদায় চাইলাম ষ্টেশন মাষ্টারের কাছে।

—না না, তাই কি হয়? কখনও আসেন না! একবার যখন পেয়ে গেছি তখন আর তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিচ্ছি না।

—তা কেমন করে হবে! আবার ট্রেন আসবে। আপনাকে সে ব্যাপারে ব্যস্ত থাকতে হবে! আমার সাথে গল্প করার আপনার সময় কোথায়? অনুযোগের স্বরে বললাম আমি।

—কিছু না, কিছু না। বিস্তর সময় আমার হাতে। আজকে আর

কোনো ট্রেন নেই। আছে ভোর চারটায়। ছোট ষ্টেশন তো! ট্রেনের ভীড় নেই বেশী। বললেন তিনি।

—তা হলে কিছুক্ষণ আলাপ করা যেতে পারে। বললাম আমি। রাত্রে কখনও ডিউটি দিতে হয় না আপনাকে?

—হয়। যখন মালগাড়ী কিংবা আপনাদের মিলিটারী রসদ আসে তখন অনেক সময় নিরাপত্তার জন্য আমাদের ডিউটি থাকে।

টোপ ফেলার জন্য বললাম,—আচ্ছা, পরশু রাত্রে একবার আসেন না আমাদের ওখানে, একত্রে খাওয়া যাবে?

আশান্বিত হয়ে বললেন তিনি—হ্যাঁ হ্যাঁ তা যাওয়া যায়। খুব বেশী দূর তো নয়? কিন্তু আমার যে গাড়ী নেই।

হতাশার সুর ধ্বনিত হলো তার কন্ঠে। বুঝলাম, পরশু যখন তার সময় আছে তখন মিলিটারী রসদ আসবে নিশ্চয় তার আগে কিংবা পরে। শরীফ ভাইয়ের কথানুযায়ী পরে হওয়াই স্বাভাবিক। বললাম,— আচ্ছা পরশুর পরদিন যদি আমি নিজে আসি হয় না? এই ধরুন, রাত ১০টা পর্যন্ত থেকে গেলাম?

মুখ বেজার করে ভদ্রলোক বললেন—না ভাই, তা সম্ভব নয়।

—কেন? প্রশ্ন করলাম আমি।

—ঐ রাত্রে আমাকে ডিউটিতে থাকতে হবে। রাত ১০টার আগেই একটা স্পেশাল গাড়ী ষ্টেশনে পৌঁছবে। সামান্য কিছু মাল পত্র নাবানর পর আবার রাত বারোটায় সেটা বর্ডারে দিকে চলে যাবে।

—তাতে কি হয়েছে! আমিও আপনার সঙ্গে থাকবো।

—সে সম্ভব নয়। আমাদের বড় সাহেবও সে গাড়ীতে আসবেন। কয়েক লক্ষ টাকার গোলাবারুদ আর পুরো একটা ডিভিশন সৈন্য থাকবে সে ট্রেনে। সাবধানতার প্রয়োজন আছে। আপনার থাকা চলবে না।

গাল্লিক লোকটার নিকট থেকে গোপন কথা বের করতে দেরী হলো না আমার। কষ্টও হলো না। তবুও বললাম,—দিনটা ছিল ছুটির দিন—বেশ জমতো কিন্তু।

—তা ঠিক। আচ্ছা ঠিক আছে। মঙ্গলবারে অর্থাৎ পরদিন আমাদের প্রোগ্রাম রইলো। আমিই যাবো আপনার কাছে।

সম্মতি জানালাম আমি। মনে মনে বললাম,—মঙ্গলবার আর তোমার জীবনে আসবে না কোনোদিন।

বিদায় নেওয়ার সময় ইচ্ছা করেই হাতটা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। খুশীতে আত্মহারা হয়ে ভদ্রলোকটি শেক হ্যাণ্ড না করে করলেন একটু মধুর চুম্বন। স্মিত হাসলাম আমি।

গাড়ী পর্যন্ত এসে তিনি বিদায় দিলেন আমাকে।

হাসপাতালে না গিয়ে সোজা চলে গেলাম শরীফ ভাইয়ের গোপন আস্তানার দিকে। একটু দূরে গাড়ী রেখে পায় হেঁটে গেলাম সেখানে। কিন্তু দুঃখ হলো ভয়ানক। সাক্ষাৎ পেলাম না কারো! ফিরে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছি এমন সময় দেখি কে একজন ছুটে আসছে আমার দিকে। চিনে ফেললাম সহজে। সংক্ষেপে বলে দিলাম তাকে সব। ট্রেন স্টেশনে মাইন ও টাইম বোমা ফিট করার উপদেশ দিলাম তাকে।

চলে এলাম হাসপাতালে। দেখি মাসুদের পরিবর্তে যে নতুন লেফ-টেন্যান্ট বদলী হয়ে এসেছেন তিনি বারান্দায় অপেক্ষা করছেন আমার জন্য। তারদিকে তাকানোর মানসিক অবস্থা ছিল না আমার। তিনটে দিন কি করে পার হয়ে যাবে তারই চিন্তায় আমি তখন বিভোর।

পর দিন ভোরে কাগজে দেখলাম কয়েকটা স্থানে বিস্তর ক্ষতি সাধন করেছে আমাদের দলের লোকেরা। প্রোনোটে অবশ্য তাদের পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হিসেব করে দেখলাম, মাসুদের অঞ্চলেই ঘটেছে ঘটনাগুলি। গর্বে আমার মন ভরে উঠলো। সেও নিশ্চয় কিছু সাহায্য করতে পেরেছে এ ব্যাপারে।

অতীত হলো আরও দুটো দিন। উত্তেজনায় কাজে মন বসলো না। ট্রেনটা নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত যেন আমি স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

ধীরে অতি ধীরে পার হয়ে গেল শেষ দিনটিও। রাত সাড়ে ছয়টার ট্রেন চলে গেল। তার পর থেকে আমার হৃদপিণ্ডের উত্থান পতন যেমন দ্রুততর হলো তেমনি নিশ্বাসও হলো শব্দমান। বারান্দার অন্ধকারে একটি চেয়ারে উপবেশন করে চোখ কান এক কথায় সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে রাখলাম স্টেশনের দিকে। কিন্তু সময় আর কাটে না।

শেষে অনেক পরে যেন আটটা বাজলো। অতি কষ্টে নয়টা। ঘড়ির কাটা যেন দশটার কাছে যেতেই চায় না। অবশেষে তাও গেল কিন্তু হতাশায় মুষড়ে পড়লাম আমি। না পাওয়া গেল ট্রেনের শব্দ, না পেলাম বোমা ফাটার আওয়াজ। বারুদের গাড়ীতে আগুন লাগলে তো এখান থেকেই তার জ্বলন্ত শিখা দেখা যাওয়ার কথা।

মনে হলো, ষ্টেশন মাষ্টার ভুল খবর দিয়েছে আমাকে। বিরক্তিতে মনটা ভরে গেল। কতক্ষণ মনের সঙ্গে ঝগড়া করছিলাম বলতে পারবো না। অকস্মাৎ আমার কানে প্রবেশ করলো দূর থেকে ভেসে আসা একটা বিকট শব্দ। ক্ষণিকের মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। সারাটা ষ্টেশন যেন একটা রক্ত পদ্মের ন্যায় ফুটে উঠলো। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো সে সর্বনাশা আগুন।

সেই প্রেমিক ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের কথা আমার মনে পড়লো। বেচারার জীবনে সত্যই আর মঙ্গলবার ফিরে আসবে না কোনোদিন।

আগুনের লেলিহান শিখা আর ভয়ার্ত মানুষের আর্ত চীৎকার আমার নারী হৃদয়ে আঘাত করলো ভয়ঙ্করভাবে। কান্নায় বুক ভেঙ্গে যেতে লাগলো। মনে হলো, এ করলাম কি আমি? এই বিভীষিকার জন্য একমাত্র আমিই দায়ী? বাইরে আর বসে থাকতে পারলাম না। অর্ধ ছুটন্ত অবস্থায় প্রবেশ করলাম শয়ন কক্ষে। মুখ লুকালাম বালিশের মধ্যে। অথচ সারা হাসপাতালের মানুষ তখন জেগে উঠেছে। মারাত্মক জখমগ্রস্ত রোগীও বাইরে এসেছে সে বীভৎস কাণ্ড দেখার জন্য।

।। ছয় ।।

ডাক্তার ঘোষলা তখনও প্রত্যাবর্তন করেননি। অথচ হাসপাতাল ভর্তি হয়ে গেল আহত রোগীতে। মেঝে, বারান্দা, ডাইনিং হল কোথাও পা ফেলার যায়গা রইল না। তাদের দেখে মনে হলো, এর চাইতে মরে যাওয়াই ছিল ভালো। বেঁচে থেকেও এরা আর কখনও পূর্ণাঙ্গ মানুষের পরিণত হতে পারবে না। সমাজের বোঝা হয়ে থাকতে বাধ্য হবে আমৃত্যু।

রাত্রে যখন একা চিন্তা করতাম তখন ভয়ানক খারাপ লাগতো আমার। মনে হতো, এতগুলি প্রাণীর মৃত্যুর জন্য অমিই তো দায়ী। আবার ভাবতাম, আর নয়। এ পথ বড় খারাপ পথ, বড় ভয়ঙ্কর পথ। সময় থাকতেই সরে পড়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে তা পারতাম না। বিশেষ করে যখন কোনো সংবাদ আসতো, যখন তারা আমার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করতো তখন আমি তা শেষ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতাম না।

একদিনের ঘটনা বলি। সকালে হাসপালের ধোপার নতুন কর্মচারিটি এক খণ্ড ভাজকরা কাগজ আমার হাতে দিলো। মুখে বললো,

—আমার নাম এম, রহীম।

মুহূর্তে বুঝে নিলাম সব। দ্রুত বাথরুমে প্রবেশ করে চিঠিখানা পড়লাম। তারা লিখেছে: যে মিলিটারী অফিসারটি প্রায়ই হাসপাতালে আসে তার নিকট থেকে জেনে নিতে হবে, তারা বর্ডারের কোন অঞ্চলে যাচ্ছিল? কেন যাচ্ছিল? এখনও কি যাবার ইচ্ছা আছে?

করণ সিংহের মৃত্যুর পর হাসপাতালে আগমনকারী কোনো সামরিক অফিসারের সাথে ইচ্ছা করেই আলাপ করতাম না আমি। সব সময় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করতাম।

ডিপার্টমেন্টাল অফিসার হাসপাতালে নিয়োজিত থাকায় আইনত তাদেরও বিশেষ সুযোগ ছিল না আমার সাথে আলাপ করার, ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার।

মিলিটারী আফিসারটি এলেন সন্ধ্যার কাছাকছি। অফিস রুমে একা বসেছিলাম আমি। তাকে আসতে দেখেই পাচিকাকে দু কাপ চা ও তার আনুসঙ্গিক তৈরী করতে বললাম।

নিজেই গেলাম ভদ্রলোকের কাছে। তিনি তখন একাকী রাউণ্ড দিচ্ছিলেন বেড টু বেড। সম্মুখে গিয়ে সহাস্য অভিবাদন জানালাম তাকে। বললাম,—একাকী আসেন কেন? আমি তো আফিসেই থাকি। একত্রেই তো আসতে পারি।

—ধন্যবাদ। আপনাকে বিরক্ত করা পছন্দ করতাম না।

—সে কি কথা? আপনার পূর্বে যারা আসতেন তারা তো আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে কখনও এদিকে এগুতেন না।

—ঠিক আছে, চলুন। আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু আমি জানি, তার কাজ আরম্ভ হয়েছে মাত্র। বললাম,—চলুন।

চা খাওয়া শেষে গল্প জমে গেল। ভদ্রলোক দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী। কয়েক পুরুষ ধরে সামরিক বিভাগের সাথে যোগাযোগ তাদের। বিয়ে সাদী তখনও করেননি। গল্পে গল্পে শোনালেন সে সব কথা।

এ কথায় সে কথায় আসল কথায় এলাম। সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলাম,—জীবনের প্রতি মায়া নেই আপনাদের? পাকিস্তান আমাদের এমন কি ক্ষতি করেছে যার জন্য আপনাদের সীমান্তে যেতে হচ্ছে?

—কী করেনি তারা? আমাদের কাশ্মীরের অনেকখানি অংশ তারা জোর দখল করে রেখেছে। অবশিষ্টটুকুও নিতে চাচ্ছে।

—তাতে আপনারা কি করবেন?

—কি আর করবো! যুদ্ধ করে ছিনিয়ে নেবো? এতোদিন আমরা মনে করতাম, যেটুকু তারা নিয়েছে তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকুক। সারা দেশটাই যখন ভাগ হলো তখন কাশ্মীরের হতে দোষ কি? কিন্তু তারা তো তাতেও সন্তুষ্ট নয়। আমাদের অংশটুকু না নিতে পারলে তাদের শান্তি নেই, ঘুম হচ্ছে না। হাজার হাজার অনুপ্রবেশকারীকে ঢুকিয়ে দিয়েছে কাশ্মীরে। অহরহ ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে আমাদের।

ক্ষয়ক্ষতি করছে বিপুল পরিমাণে। যুদ্ধ বাধানর পাঁয়তারা করছে। তাই আমরা এখন স্থির করেছি যে, আঘোষিত যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাদের আযাদ কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবো।

—তারা কি যুদ্ধ করবে না? সহজে ছেড়ে দেবে?

—সহজে কি দিতে চায়? বললাম না? তাদের জানতেই দেবো না। অতর্কিত আক্রমণ করবো।

—কিন্তু জাতিসংঘ কি দেখবে না? তারা আপনাদের দোষারূপ করবে না? যুদ্ধ বিরতি আদেশ প্রদান করবে না?

—হয় তো করবে কিন্তু তার আগেই আমরা দখল করে নেবো।

মনে মনে খুশী হলাম আমি। এতো গোপন কথা প্রথম আলাপে বের করা যাবে আন্দাজ করতে পারিনি আগে।

ইচ্ছা করে একটু বাধা দিলাম। মৃদু হাসলাম। তার জ্ঞানের প্রসার-তার কথা উল্লেখ করলাম। বললাম,—আমরা ডাক্তার মানুষ, রাজনীতি আর সমরনীতির কিছুই বুঝি না। কিন্তু আপনি দেখছি সবজান্তা। এতো খবর আপনি পেলেন কোথায়? সব অফিসারই কি জানেন?

—না না। সবাই জানবে কোত্থেকে।

তার কথা শুনে আমি অনেকখানি আশান্বিত হলাম। আলমারী খুলে হাসপাতালের স্টক থেকে স্যাম্পেন বের করে পান করার জন্য তাকে অনুরোধ করলাম। ভারী খুশী হলেন ভদ্রলোক। বেশ অভ্যস্ত বোঝা গেল। একই সঙ্গে দু গ্লাস গলধঃকরণ করলেন। মাথা তার আরও খুলে গেল। এবার তিনি সমর মন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করতে লাগলেন। গড়গড় করে বলে গেলেন সব প্লানের কথা। কোন তারিখে কিভাবে তারা হাজিপীর পাস, তিথওয়াল, উরি, পুঞ্চ, নওশেরা, মেনধার প্রভৃতি সেক্টর আক্রমণ করবেন সব বলে গেলেন। সবকিছু মনে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তার সমনে লিখতেও সাহস পেলাম না। বাধ্য হয়ে তাকে তাড়াতাড়ি বিদায় দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কারণ পরে ভুলে যাবার সম্ভাবনা ছিল।

কিন্তু কিছুতেই তিনি বেরুতে চাইলেন না। মনে তার রং ধরলো। সারা দেহ মাদকতার লক্ষণ পরিস্ফুট হলো। তিনি আমাকে উপভোগ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগলেন।

সাধারণ রোগীদের পরীক্ষা করার জন্য আমার অফিস রুমের উত্তর পশ্চিম কোণে একটা লোহার ফ্রেমের খাট ছিল। তিনি জোর করে আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। মুখে দু একটা কিস্‌ও করে বসলেন। দুর্গন্ধে বমি হবার মতো অবস্থা তখন আমার। মনে মনে আমি আউড়িয়ে চলেছি সেক্টরগুলোর নাম আর তারিখ। ভাবছি, কোনো প্রকারে যদি সংবাদটা শরীফ ভাইয়ের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়, আর তারা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, আমার গোয়েন্দাগিরি তবে সার্থক হবে।

কিন্তু মাতালটার হাত থেকে রেহাই পাই কি করে? চেঁচাতে আমি পারি। রাত বেশী হয়নি। নার্স-আয়ারা হয় তো আশে-পাশে কোথাও আছে—দারোয়ান তো রয়েছে। অন্ততঃ একজন এলেও দানবটা হয় তো লজ্জা পেত। ক্ষান্ত হতো।

কিন্তু হাসপাতালের লেডী ডাক্তার হয়ে আমি চেঁচাই কেমন করে! সকালে কি মুখ দেখাতে পারবো তাদের? মুখ বুজে তাই ধ্বস্তা ধ্বস্তি করতে লাগলাম তার সাথে। আত্মরক্ষা করার জন্য আমি যতো দরজার দিকে আসি, তিনি ততো খাটের দিকে নিয়ে যেতে চান আমাকে।

মদ খেয়েছিলেন তিনি অত্যধিক! তাই হয় তো নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে সামলাতে পারছিলেন না। তার অবস্থাটা আমি যখন বুঝতে পারলাম তখন তার বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্য শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে একটা ঝাঁকা দিলাম। অদ্ভুত ফল হলো তাতে। সামলাতে পারলেন না তিনি নিজেকে—মাথা লাগলো তার লোহার খাটের সম্মুখের রডটার উপর। যন্ত্রণায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন তিনি। নার্সরা ছুটে এলো। হাসপাতালে ডিউটিরত সামরিক অফিসার মিঃ পাণ্ডে এলেন

আর এলেন ডাক্তার ঘোষলা। বেচারার অবস্থা দেখে সবাই বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। নার্স ব্যাণ্ডেজ করে দিলো তার মাথায়। মিঃ পাণ্ডে পৌঁছে দিয়ে এলেন তাকে সামরিক ঘাটিতে।

আর কোনদিন আসেন নি সেই ভদ্রলোক আমাদের হাসপাতালে।

সারাদিনের মধ্যে বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ হলো না। ধোপার সেই ছেলেটিও এলো না। অন্য কোনো লোকও নয়। তারা হয় তো ভাবতেই পারেনি, এতো তাড়াতাড়ি আমি কার্য উদ্ধার করতে পেরেছি। কিন্তু গুপ্ত সংবাদ লিখে রাখা কোনো প্রকারেই নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় যে কোনো লোকের নজরে পড়তে পারে তা। শরীফ ভাইয়ের কথা মনে হলো: আপনার সামান্যতম গাফলতি আমাদের বিরাট বিপদ ডেকে আনতে পারে।

গাড়ী নিয়ে একাকী রাত্রে বের হওয়া নিরাপদ নয়। ডাক্তার ঘোষলার কাছে কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। স্থির করলাম তাই, পায়ে হেঁটেই অন্ধকারে যাবো।

সারা দেহে কালো পোশাক পরে, কাগজখানা চুলের মধ্যে গুজে দিয়ে টর্চ লাইট হাতে নিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে পড়লাম গোপন পথে। রাত তখন আটটা। বা'র থেকে আর কোনো দর্শন প্রার্থীর আসার সম্ভাবনা ছিল না। ডাক্তার ঘোষলা সাধারণতঃ রাত্রে রুমের বাইরে আসেন না।

হন হন করে ছুটে চলেছি রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে। বিশ মিনিটের মধ্যে কারো সাথে দেখা হলো না। সত্যিকথা বলতে কি, এইদিনই মনে হলো আমি স্পাই। এক দুঃসাহসিক কাজে নেবেছি। অন্ধকার রাত্রে একাকী পথ চলা যে এতো ভীতিপ্রদ তা জানলে বের হতাম না। কিন্তু কি করবো, এ পথ বড় ভয়ঙ্কর পথ। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। বিলম্বেও লাভ নেই।

ত্রিশ মিনিট চলার পর হঠাৎ একটা মোটর সাইকেলের শব্দ আমার কানে ভেসে এলো। দেহ থর থর করে কাঁপতে লাগলো। এ

অঞ্চলের কোনো লোকের সাহস ছিল না রাত্রে মটর সাইকেলে বেরুনো। নিশ্চয় মিলিটারী গার্ড। ওরা মাঝে মাঝে নানা কাজে এ পথে যাতায়াত করে।

দেখতে দেখতে সাইকেলটা এগিয়ে আসতে লাগলো আমার দিকে। আমি উপায়ান্তর না দেখে একটা মোটা গাছের আড়ালে আত্মগোপন করলাম। খোদার নাম শরণ করতে লাগলাম।

মটর সাইকেল আরোহী সত্যই একজন মিলিটারী সার্জেন্ট ছিল। সে আমাকে দেখতে পেল না। পাশ কাটিয়ে চলে গেল পঞ্চাশ মাইল স্পীডে।

বিপদ কেটে গেল। বেরিয়ে পড়লাম আবার রাস্তায় খোদার নাম শরণ করে। দ্রুততর গতিতে এগিয়ে চললাম লক্ষ্য পথে। একটানা আরও পনেরো মিনিট হাঁটার পর পৌঁছে গেলাম আমার লক্ষ্যস্থলে। ঘরে কোনো লোক আছে বলে মনে হলো না। পর পর পাঁচবার দরজায় টোকা দেওয়ার পর ধীরে ধীরে দরজাটা খুলে গেল। মুখ বাড়িয়ে দিলো একজন অপরিচিত লোক। আমাকে দেখে সে সন্দেহ করলো না। নাম জানতে চাইলো। বললাম, আমার নাম এম, মীরা। ভিতরে আহবান করে সে তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, পেরেছেন কিছু সংগ্রহ করতে? বললাম,—হ্যাঁ, দেরী করতে পারবো না। সংবাদটা পৌঁছে দেবেন যথাস্থানে। খুব জরুরী সংবাদ কিন্তু।

—ঠিক আছে। সঙ্গে যেতে হবে?

—বললাম,—না, তার প্রয়োজন হবে না।

আবার বেরিয়ে পড়লাম সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে। মনটা কিছুটা হালকা হলো যেন এবার। বিপদমুক্ত মনে হলো নিজেকে।

কিন্তু মানুষ যা মনে করে তা যে সব সময় ঠিক হয় না তার প্রমাণ পেলাম পনেরো মিনিট আসতে না আসতেই। নিশ্চিন্ত মনে চলছিলাম রাস্তা দিয়ে হঠাৎ মাত্র পাঁচ হাত দূরে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলে উঠলো। তার আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেই মিলিটারী সার্জেন্টের মুখ. পার্শ্বে রয়েছে তার হোণ্ডাখানি। বুকটা আবার ধক্

থর করে কেঁপে উঠলো। মনে মনে বৃথা সাহস যোগাতে চেষ্টা করলাম।

—কে ওখানে? কড়া গলায় শুধালো লোকটি।

—আমি লেডি ডাক্তার মীরা। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলাম।

—কোথায় গিয়েছিলেন একাকী?

—পাশের গ্রামের একটা রোগী দেখতে!

—সঙ্গে কেউ নেই কেন?

—ইচ্ছা করেই আনিনি। তা ছাড়া বাড়তি লোক তো কেউ নেই হাসপাতালে। আমার সাথে রাত্রে বেরুতে তারা বাধ্য নয়। জোর করাও বেআইনী।

—আপনার দূর গ্রামে পায়ে হেঁটে রাত্রে রোগী দেখতে যাওয়ার আইন আছে নাকি?

—না, মানবতার খাতিরে করতে হয়।

—কতো টাকা ভিজিট দিয়েছে?

—নেইনি।

—কিসের রোগী? সে জিজ্ঞেস করলো আবার।

—ডেলিভারী কেস।

- যান, আর কখনও এমন কাজ করবেন না।

—না, কখনও করবো না।

চলে গেল মিলিটারী সার্জেণ্ট। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ালো যেন আমার। খোদার নাম জপ করতে করতে অতিদ্রুত গতিতে অতিশয় সন্তর্পণে চলে এলাম হাসপাতালে। পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম আমি।

রাত্রে ঘুম হলো বড় আরামে। অতিশয় নিশ্চিন্তে।

সকাল গড়িয়ে গেল, দুপুর অতিক্রান্ত হলো, কাজ করে গেলাম একটানা। বিকেলে একজন মেজর এলেন আমাদের হাসপাতালে। আমার পাশ কেটে চলে গেলেন তিনি ডাক্তার ঘোষলার কক্ষে। অনেকক্ষণ

কি সব আলোচনা করলেন তারা। তারপর নিষ্ক্রান্ত হলেন মেজর সাহেব।

আমার মনে কোনো সন্দেহ হয়নি। হবার কথাও নয়। কিন্তু সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ডাক্তার ঘোষলার ঘরে ডাক পড়লো আমার। ঈশারায় চেয়ারে বসতে বললেন তিনি আমাকে। বেশ কিছুক্ষণ মৌনতা অবলম্বন করার পর তিনি মুখ খুললেন। বললেন,—কিছু মনে করবে না। অশোভন হলেও বাধ্য হয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করতে হচ্ছে। তুমি কি কাউকে ভালবাসো?

কোনো জবাব দিতে পারলাম না। ডাগর ডাগর চোখদুটো শুধু তুলে ধরলাম তার মুখের উপর। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন,—যদি কারো সঙ্গে তোমার গোপন সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় তবে তাকে এখানেই আসতে বলবে। অন্ধকার রাত্রে বাইরে গিয়ে সাক্ষাৎ করা তোমার পক্ষে যেমন নিরাপদ নয় তেমন নয় মর্যাদাকর। ঐদিন মিলিটারী অফিসারের প্রতি তোমার অশোভন ব্যবহার ভয়ঙ্কর হলেও অপরাধ তার ঘাড়েই চেপেছে। সে যে মদ পান করেছিল তার প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম। কিন্তু গতরাত্রে তোমার বাইরে বেরনোর কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। তাদের সন্দেহ হয়েছে, তাই তারা তদন্ত করার জন্য আমার কাছে এসেছিল। আমি তোমার নির্মল চরিত্রের সাফাই গেয়েছি। তাদের হয় তো বুঝাতে পেরেছি। মনে রাখবে, তুমি সামরিক বিভাগের কর্মচারী। বিপদ যে-কোনো দিক থেকে যে-কোনো সময় আসতে পারে। দেশের অবস্থা এখন মোটেই ভালো না। সাবধান হয়ে চলাই তাই যুক্তিসংগত।

নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম আমি। একটা কথাও বললাম না। কী বা বলার ছিল আমার? ডাক্তার ঘোষলা আরও বললেন,—ওরা কালই এ ক্যাম্প উঠিয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছে বলে বেশী কিছু করলো না। হয়তো ক্ষমা করবে। কিন্তু হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠাতে পারে। সত্য-মিথ্যা কি লিখবে জানি না। ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হবে। এমন কাজ আর করবে না। মিলিটারী অফিসাররা এখন পরিবার পরিজন ছাড়াই থাকে। তাদের ব্যবহার অশোভন হওয়াই স্বাভাবিক।

অতি কষ্টে আমি মুখ খুলতে পারলাম। বললাম,—আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

—সারাদিন পরিশ্রম করেছ। বিশ্রাম করো গিয়ে।

যাবার বেলায় একটা কথাও বলতে পারলাম না। মাথাটা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। বিছানায় গা এলিয়ে দিলাম। বাতিটা নিবিয়ে দিয়ে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। মনে হলো,—একটু আগেও যদি জানতে পারতাম যে এখান থেকে মিলিটারী ক্যাম্প উঠে যাচ্ছে। তা হলে শেষ বারের মতো আর একটা আঘাত করা সম্ভব হতো।

সুযোগ তবু এলো। সকালে দেখলাম হাসপাতালের ধোপার সেই নতুন কর্মচারীটি কাজে এসেছে, এক সময় ঈশারায় তাকে কাছে ডেকে বললাম,—একখানা কাগজ পৌঁছে দিতে পারো এখনই?

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো সে।

মন আমার আবার হিংস্রতায় ভরে গেল। তাড়াতাড়ি কয়েকটি শব্দে সাহায্যে জানিয়ে দিলাম ক্যাম্প উঠিয়ে মিলিটারীদের বর্ডার অভিমুখে যাওয়ার সংবাদ। বিস্তারিত কিছু লেখা সম্ভবপর হলো না।

কাগজখানা জামার পকেটে রেখে ছেলেটা উৎফুল্লচিত্তে হন হন করে চলে গেল গ্রামের দিকে।

কোনো খবর পেলাম না সারাদিন। রাত্রেও না। ঘুম হতে চাইল না সারা রাত। এক অনির্বচনীয় মানসিক উত্তেজনায় অতিবাহিত হলো বিনিদ্র রজনী।

পরদিন সকালের সংবাদ পত্রে যে খবর দেখলাম তাতে চোখের পানি সংবরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না।

সংবাদে প্রকাশ: ১৪।১৫ বছরের একটা ছেলে সামরিক বাহিনীর গতিপথের ধারে চলাফেরা করছিল। অকস্মাৎ সে ট্যাঙ্ক বাহিনীর দ্বিতীয় ট্যাঙ্কটার নীচে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে মাইন ফেটে তিনটি ট্যাঙ্ক বিধ্বস্ত হয়েছে। ছেলেটার পোশাকের নীচে মাইন ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে।

খবরটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে কান্নায় আমার মন ভেঙ্গে পড়লো। মনে হলো,—আমার জন্যই ছেলেটা আত্মবিসর্জন দিয়েছে।

হয় তো সংবাদটা পৌঁছে দেবার মতো কাউকে সে পায়নি এই অল্প সময়ের মধ্যে, কিংবা তার উপরই অর্পিত হয়েছিল সুযোগ বুঝে বোমা কিংবা মাইন ব্যবহার করার দায়িত্ব। কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ অভাবে হয় তো মাইন পুতে রাখতে পারেনি রাস্তায়। অপব্যবহারও করতে চায়নি সে সুযোগের। তাই জীবন বিসর্জন দিয়ে পালন করেছে তার কর্তব্য।

ছেলেটার আত্মত্যাগের আদর্শ অনুকরণযোগ্য। কিন্তু সে বেঁচে থাকলে এর চাইতেও বৃহৎ কাজে কি সে আসতে পারতো না? মনের কাছে প্রশ্ন করলাম আমি।

—হয় তো পারতো। কিন্তু যে কর্তব্য সে সম্পাদন করলো তার মূল্য কি কিছুর চাইতে কম? মাত্র তিনটি ট্যাঙ্কের ধ্বংস সাধনের কথাই কি শুধু চিন্তা করতে হবে? তার উদ্দেশ্য ও সাহসিকতা দেশপ্রেমের মাপকাঠিতে কি বিচার করতে হবে না? তার বয়সী আরও বহু ছেলে তো দেশে রয়েছে। কতজন পারবে সবার অলক্ষ্যে দেশের জন্য এতরড় ত্যাগ স্বীকার করতে?

মনের এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না। পারবে না পৃথিবীর ইতিহাস। সর্ব দেশের সর্ব যুগে এমনি অপাংতেয় মানুষের অলিখিত ত্যাগ আর তিতিক্ষার বলেই অন্যায়ের প্রতিকার হয়েছে। মানুষ স্বাধীনতা লাভ করতে পেরেছে—পেরেছে তা উপভোগ করতে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর কি কেউ খোঁজ করেছে তাদের বংশধরদের কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের অন্যদের? ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করেছে কেউ আন্তরিকভাবে? গড়ে তুলেছে কোনো মনুমেণ্ট?

এককথায় এর সাফ জবাব দেওয়া যায়,—না।

তবু এর প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে দেশের জন্য, জাতির জন্য। প্রয়োজন আছে মানবতার জন্য। অন্যায়ের প্রতিকার আর ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার জন্য।

।। সাত ।।

ভারতীয় বাহিনীর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা সব আভ্যন্তরীণ ঘাটি উঠিয়ে বর্ডার অঞ্চলে নতুন নতুন ফাঁড়িতে চলে গেল। আমাদের মুক্তি যোদ্ধা বাহিনীর সক্রিয় কর্মীরাও তাই পাড়ি জমালো সেদিকে। আমি শুধু পড়ে রইলাম দূরে। একটা সংবাদ পেলাম না এক সপ্তাহর মধ্যে। অতিষ্ঠ হয়ে পড়লাম তাই।

হাতে কোনো কাজ না থাকায় এবং আমার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় কেমন যেন খারাপ লাগতে লাগলো। মনে হলো বর্ডার সাইডে যেতে পারলে ভালো হতো। সক্রিয় সহযোগিতা করতে পারতাম।

আমার প্রাণপাখী মাসুদের জন্যও মনটা আই ঢাই করতে লাগলো। তার একটা পত্র কিংবা সংবাদ প্রাপ্তির জন্য ভয়ানক উতলা হয়ে পড়লাম। খোদার কাছে সর্বক্ষণ মোনাজাত করতে লাগলাম।

খোদা বোধহয় আমার মনের আবেদনে সদয় হলেন। দুদিন পরেই আমার বদলীর আদেশ এলো। বর্ডার থেকে সামান্য দূরে দোডা শহরের সন্নিকটে একটা অস্থায়ী সামরিক হাসপাতালে বদলী করা হলো আমাকে। আদেশ পত্রখানা দেখে ডাক্তার ঘোষলা বললেন, কি করবো মা। যেতেই হবে তোমাকে।

—তাতে আর আশ্চর্য কি? আপনারও বা করণীয় কি আছে?

—আছে, কিন্তু কিছুই করতে পারবো না আমি এখন। দেশে বর্তমানে এক মারাত্মক অবস্থা বিরাজ করছে। দোডা শহরেই তা আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে। এ অবস্থা না হলে আমি তোমাকে সেখানে যেতে দিতাম না।

—কি করতেন?

—বদলীর আদেশ রদ করার জন্য উপরওয়ালার কাছে লিখতাম।

কিন্তু এখন কেউ শুনবে না। তারা আমার লেখার প্রতি কোনো গুরুত্ব আরোপই করবে না।

—কেন? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—এখন সব আদেশ কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানেই হয়ে থাকে। তা রদ করার ক্ষমতা কাশ্মীর সরকারের নেই।

—কি হচ্ছে দোডায়?

—অনুপ্রবেশ কারীরা সামরিক বাহিনীকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। তারা স্থানীয় অধিবাসীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ ভাব পোষণ করছে না। শুধু সামরিক বাহিনীর লোকজনদের উপরই গোপন আক্রমণ চালিয়ে যথেষ্ঠ পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হচ্ছে। শুনলাম, গতকালই সেখানে ট্রেঞ্চ আর বাঙ্কার খোঁড়ার সময় তারা অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পঞ্চাশ জনের উপরে ভারতীয় সৈন্যকে হত্যা করেছে। আহত করেছে আরও অধিক সংখ্যককে।

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম,— সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাদের কিছু করতে পারেনি?

—কি আর করবে? মাত্র তিনজনকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছি। বন্দী করতে পারেনি কাউকে। ফলে তাদের গোপন আড্ডায় সন্ধান আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। তবে তারা নিরলস ভাবে অনুসন্ধান অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে।

ডাক্তার ঘোষলার কথা শুনে হৃদয়ে আমার ভয়ের উদ্রেক হলো না বরং মনটা আনন্দে ভরে গেল। মনে হলো, আমাকে দিয়ে আরও কিছু করানর অভিপ্রায়েই খোদা বদলী করিয়ে সঠিক স্থানে প্রেরণ করেছেন। মুখে বললাম,— এ আদেশ ক্যানসেল করা যায় না? আমার কিন্তু খুব ভয় হচ্ছে।

—না, এ পরিস্থিতিতে বদলীর আদেশ রদ করার উপায় নেই। চেষ্টা করা ঠিক হবে না। ওটা নতুন হাসপাতাল বলেই তোমাকে সেখানে দিয়েছে। নতুন হাসপাতালে অভিজ্ঞ লোকের দরকার।

তুমি বরং ট্রানজিট প্রিয়ডে বাড়ী থেকে ঘুরে যেতে পারো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার পূর্বে পিতামাতার সঙ্গে দেখা করে যাওয়াই ভালো।

ডাক্তার ঘোষলার উপদেশটা ভালো লাগলো। আমি চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে দেশের বাড়ীতে চলে গেলাম। সীমান্ত ঘাটিতে বদলীর কথা শুনে মা আমার কেঁদে ফেললেন। বাবা না কাঁদলেও দুর্বল হয়ে পড়লেন। বললেন,—গরীব মানুষ আমরা। চাকরী যখন করতে হবে তখন কেঁদে কি লাভ! আশীর্বাদ করি, যেখানেই থাক নিরাপদে থাক নির্ঝঞ্ঝাটে থাকো।

মুরব্বীদের দোয়া আর আশীর্বাদকে সম্বল করে চলে এলাম আমার নতুন কর্মক্ষেত্রে। কিন্তু তখন জানতাম না যে, জীবনে আর তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ হবে না।

আমি যখন হাসপাতালে পৌঁছিলাম তার আগেই সেখানে একাধিক ভয়াবহ সংঘর্ষ ঘটে গেছে। হাসপাতাল ভর্তি রোগী। ডাক্তার আমাকে নিয়ে মাত্র দুজন। নার্সের সংখ্যা বেশী থাকলেও কাউকে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মনে হলো না।

রোগীদের মধ্যে কতজন মিলিটারী, কতজন সিভিল আর কতজন মুক্তিযোদ্ধা বাছাই করা কঠিন।

শহরের অবস্থা তখন অবশ্য শান্ত। তবে যেকোনো সময় আবার ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে। পরদিন ২৫শে জুলাই (১৯৬৫), জিলা ম্যাজিস্ট্রেট সকল প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র সরকারী গুদামখানায় জমা দেবার জন্য আদেশ জারী করলেন। প্রতিপালিত হলো তার সে আদেশ কিন্তু বিনা লাইসেন্স-এর কোনো অস্ত্র কেউ জমা দিলো না। অথচ লাইসেন্স বিহীন অস্ত্রই ছিল ঐ অঞ্চলে বেশী।

শহরের পরিবেশটা খারাপ লাগলো আমার কাছে। একদিনেই হাসপাতালের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

পরদিন অর্থাৎ ২৬শে জুলাই তারিখে ভারতীয় সৈন্যরা ভিম্বার এলাকার বাগসার থেকে আট মাইল পূর্বে পাকিস্তান অধিকৃত

কাশ্মীরের মোজাহীদ বাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালো। মনে হয় পাকিস্তানী ফাঁড়ির শক্তি পরীক্ষা করাই ছিল তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য। কিন্তু পাকিস্তানী মোজাহীদ বাহিনীর জবাবে তিনজন ভারতীয় সৈন্য প্রাণ হারালো আরও অনেককে মারাত্মক আহত অবস্থায় আমাদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হলো।

সকাল বেলা হাসপাতালে রাউণ্ড দেবার সময় একটা বেডের কাছে যেতেই একজন রুগী অনুচ্চ কণ্ঠে আমাকে জিজ্ঞেস করলো,

—আপনি এম, মীরা নন?

আমার নামের পূর্বে 'এম' অক্ষরটা শুনেই অন্তর আমার আনন্দে ভরে গেল। স্মিতহাস্যে বললাম,—হাঁ আপনার নাম কি?

—এম, মেহদী। আমাকে আজকেই যদি মুক্তি দিতে পারেন তবে আমি আপনার খবর শরীফ ভাই ও মাসুদ সাহেবের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো।

—চেষ্টা করবো। বললাম ইশারায়। মাসুদ কোথায় আছে, কেমন আছে জানতে চাইলাম তার কাছে। সে বললো,—কাছেই আছেন তিনি। সংবাদ পেলে হয় তো সাক্ষাৎ করার জন্য আসতেও পারেন। তাকে বর্ডারে নিয়োগ করা হয়েছে।

—তুমি আমাকে চিনলে কি করে? প্রশ্ন করলাম আমি। সে জবাবে বললো, আপনার সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতেই মনে হয়েছে আমার। আপনার বদলীর খবর অবশ্য তারা জানেন না।

—ঠিক আছে কাউকে বলো না যেন কিছু।

কি করে মেহদীর পলানর পথ প্রশস্ত করতে পারি সে কথাই চিন্তা করলাম সারা দিন ধরে। ওকে মুক্তি দিতে পারা মানেই শরীফ ভাইয়ের কাছে আমার বদলীর খবর পেঁছে দেওয়া। তারপর যোগাযোগ ও খবরাখবরের পালা। বিপদের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দেশের সেবা করা। মুক্তির দিনকে এগিয়ে আনা।

উপায় হয়ে গেলো। সন্ধ্যার সময় একজন প্রহরী আমার অফিসে এসে লম্বা সালাম ঠুকে মিনতি করে বললো,—দিদি আমাকে রক্ষা করতে হবে।

—কেন, পাকিস্তানের মিলিটারী তোমাকে মেরে ফেলছে নাকি? জিজ্ঞেস করলাম আমি। সে জবাবে দাঁতে জিব কেটে বললো,

— রাম রাম, কি যে বলেন আপনি! ওদের ক্ষমতা আছে এখানে প্রবেশ করার? নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না তবে? একটু সবুর করুন না. দেখবেন এক মাসের মধ্যে কাশ্মীর এবং লাহোর শহর আমাদের দখলে চলে আসবে।

—কেমন করে?

যুদ্ধ করে।

—অতো সহজ হবে কি? তারাও তো যুদ্ধ করতে জানে।

—হাতি জানে। প্রধান মন্ত্রী আদেশ করছেন, যেকরেই হোক এবার পাকিস্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হবে।

—তুমি তো অনেক খবর রাখো দেখছি! লাহোরে আমার এক আত্মীয় থাকে। দেখা হবে তা হলে তাদের সাথে?

—নিশ্চয়। সবাই তো সে কথা বলে।

—পাকিস্তান তো দূরের কথা কাশ্মীরের মুক্তি যুদ্ধাদেরই তো তোমরা জব্দ করতে পারছো না।

— পারবো। পিপড়ের পাখনা ওঠে মরার জন্য। ওদের এবার মরণ পাখনা উঠেছে। যাক সে কথা। আমাকে একটু ওষুধ দেন দিদি।

—কিসের ওষুধ? কি হয়েছে তোমার? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে আমার মাথায়। রাত দশটা থেকে আবার ডিউটি আছে। একটু ওষুধ দিন না আমাকে?

মাথায় আমার দুষ্টু বুদ্ধি চাপলো। জিজ্ঞেস করলাম,—কয়জন থাকবে তোমরা ডিউটিতে?

—দুই জন। আমি থাকবো বারান্দায় আর মহাবীর থাকবে গেটে।

কথা বাড়ালাম না। দুটো কডোপাইরিন এনে তার হাতে দিয়ে বললাম,—এ দুটো এখন খেয়ে নাও। দেখবে ভালো হয়ে গেছে। তারপর দুটো ঘুমের ট্যাবলেট দিয়ে বললাম,—এ দুটো ডিউটিতে যাবার দু মিনিট আগে খেয়ে নেবে।

কডোপাইরিন দুটো তখনই খাইয়ে দিলাম। খুশী হয়ে চলে গেল সে।

রাত আটটায় হাসপাতালে রাউণ্ড দেওয়ার কথা নয় আমার তবু গেলাম। এ বেড সে বেড ঘুরে, সবাইকে কিছু না কিছু প্রশ্ন করে এক সময় গিয়ে হাজির হলাম মেহদীর কাছে। সে তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। আগামী কাল সকালেই তাকে জেলে নিয়ে যাবার কথা।

ওর কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বললাম,—সব ব্যবস্থা করেছি। রাত এগারোটায় খুব সাবধানে আমার কক্ষে আসবে।

অনেক দিন পরে কোড ল্যাংগুয়েজে একটা চিঠি লিখতে বসলাম। লিখলাম, ভারতীয় সৈন্যদের পরিকল্পনা, আমার অবস্থিতি এবং কাজ করার সুযোগ-সুবিধার কথা। লেখা অর্ধেক হয়েছে এমন সময় পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলেন ক্যাপ্টেন ডাক্তার দুলারাম। তিনি আমার ঊর্ধতন কর্মকর্তা। চেয়ার ছেড়ে উঠলাম, হাতে নিলাম কাগজখানি। কামিজের নীচে লুকানোর চেষ্টা করবো কি না চিন্তা করছি এমন সময় তিনি বললেন,—কী ব্যাপার? কার কাছে পত্র লেখা হচ্ছে? কেউ আছে টাছে নাকি?

—খুব লজ্জা পেয়েছি এমন ভাব দেখালাম। প্রেয়স যে একজন আছে তাও স্বীকার করে নিলাম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।

বুকটা দুরু দুরু করতে লাগলো। ভাবলাম—ভদ্রলোক যদি হাত বাড়িয়ে নিতে চান কাগজখানা, দেখতে চান আমার প্রেমপত্রের ভাষা তাহলে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। হাতে হাতে ধরা পড়ে যাবো। সব ফাঁস হয়ে যাবে। মাসুদকেও রক্ষা করা সম্ভব হবে না। অকালে প্রাণ হারাতে হবে আমাদের! কাশ্মীরের মুক্তি সংগ্রামেও হয়তো নেবে আসবে বিফলতা। নির্মূল হবে কর্মীবৃন্দ। মনে হলো শরীফ ভাইয়ের কথা: 'মনে রাখবেন, আপনার সামান্যতম অসতর্কতা আমাদের মারাত্মক বিপদ ডেকে আনতে পারে।'

দু:খে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হলো। অন্তত: দরজাটা বন্ধ করে কাজে বসতে হতো। এতো এলোকাছায় স্পাইগিরি করা যায় না।

কিন্তু খোদা আমাকে রক্ষা করলেন। ডাক্তার দুলারাম বললেন,—চলি, ডিসটার্ব করা উচিত নয়। পরে আসবো।

মৃদুহাস্যে বললাম,—না না বসুন। পরে লেখা যাবে 'খন। তবু তিনি বসলেন না। আমিও মুক্তি পেলাম দুশ্চিন্তার হাত থেকে।

একাজে সেকাজে রাত গড়িয়ে এলো। দশটা অতিক্রান্ত হলো, এগারোটার কাছাকাছি ঘণ্টার কাটা ঘুরে এলো, আমার মানসিক উত্তেজনা ও দেহের চঞ্চলতা বেড়ে গেল কিন্তু মেহদী তখনও এলো না। দুচিন্তায় ঘুমাতেও পারলাম না, হাসপাতালের ওয়ার্ডে যাওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভাবলাম, এতো সুন্দর প্লানটা বোধ হয় মেহদীর বোকামীর জন্য শেষে বানচাল হয়ে গেল।

এগারোটা বিশ হতেই দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ হলো। নিঃশব্দে দরজা খুলে গেল। প্রবেশ করলো মেহদী। বাত্তি আগেই নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার হাতে চিরকুটখানা দিয়ে বললাম,—যে কোনো উপায়ে এখানা শরীফ ভাইয়ের হাতে পৌঁছে দেবে। মাসুদ সাহেবকে সংবাদ দেওয়া চাই কিন্তু।

—কিন্তু পালাবো কেমন করে? গার্ড রয়েছে যে!

—সে ব্যবস্থা আমি করেছি। এই শিশিতে মরফিয়া আছে। বারান্দার গার্ডকে আগেই ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি। মাত্র দুটো বড়ি খেয়েছে সে। হয়তো নিদ্রা হবে না তার। তবে তন্দ্রাবিভূত হয়ে পড়বে সে নির্ঘাৎ। তুমি পিছন থেকে অকস্মাৎ তাকে আক্রমণ করবে কথা বলার সুযোগ দেবে না। শিশির মরফিয়া আগেই রুমালে মাখিয়ে নেবে। ল্যাট্রিনের মধ্যে গিয়ে সমাধা করবে সবকিছু! রুমাল গার্ডের নাকে ধরতে পারলেই সে অচেতন হয়ে যাবে। তারপর তার রাইফেলটা নিয়ে অতি সন্তর্পনে গেটে যাবে। প্রয়োজন হলে রাইফেল ব্যবহার করবে সেখানে। পেছন থেকে মাথায় আঘাত করতে পারলেই কাজ হবে। গুলী না করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

—সে পারবো। কিন্তু রুমাল নেই যে আমার?

সময় নষ্ট করা যুক্তিসংগত নয়। রাত বারোটা প্রায় বাজে। সমগ্র হাসপাতালে মৃত্যুর মতো নীরবতা বিরাজ করছে। বললাম ঠিক আছে, আমারটাই নিয়ে যাও।

রুমাল আর মরফিয়ার শিশি নিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলো মেহদী। অন্ধকারে বিদায়ের ছালাম জানালো সে। ঘরের দরজা বন্ধ করে বিছানায় দেহ এলিয়ে দিলাম। কান কিন্তু রইল আমার উৎকর্ণ হয়ে হাসপাতালের দিকে।

অনেকক্ষণ অতিবাহিত হলো। কোনো সাড়া শব্দ আর পাওয়া গেল না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না।

সকালে যখন ঘুম ভাংলো তখন মহা হুলুস্থুল পড়ে গেছে সাড়া হাসপাতালে। সেন্ট্রি দুজনই নিহত। একজন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে, অন্যজন মাথায় মারাত্মক আঘাত খেয়ে। একজন রোগীও পলাতক। রাইফেল নেই একটিও।

আমার নিদ্রাভঙ্গ হবার অনেক পূর্বেই সংবাদ চলে গিয়েছিল সামরিক ছাউনীতে। কয়েকজন জাঁদরেল অফিসার এসেছেন স্বচক্ষে দেখতে, সরেজমিনে তদারক করতে।

পলাতক আসামীই যে এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তাতে কারো সন্দেহ রইল না। তারা আমাদের রিপোর্ট নিয়ে চলে গেলেন। বিপদ কাটলো বলে মনে হলো আমার।

মিলিটারী অফিসারগণ চলে যাবার পর বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্য ডাক্তার দুলারামের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে কক্ষের দিকে পা বাড়াতেই তিনি আমাকে অস্বাভাবিক গম্ভীর কন্ঠে বললেন,—বসুন মিস মিরা, জরুরী কথা আছে।

তার কন্ঠস্বরই আমার এক মারাত্মক গোপন বিপদের স্পষ্ট ইঙ্গিত দান করলো। ভয়নক ঘাবড়ে গেলাম আমি। কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহসী হলাম না।

ডাক্তার দুলারাম চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। আলমারী খুলে কি যেন বের করলেন আমাকে আড়াল করে। তারপর চেয়ারে প্রত্যাবর্তন করে

বললেন,—এ রুমালখানি কার?

বুঝলাম ধরা পড়ে গেছি। মিথ্যা বলে লাভ হবে না। তিনি আমার রুমাল ভালো করেই চেনেন। ভয়ে ভয়ে বললাম,—আমার। কিন্তু কেন? আপনার কাছেই বা আসলো কেমন করে?

—কাল সন্ধ্যায় যদি চুরি করে এনে থাকি?

—না, তা হতে পারে না। আপনি চলে আসার পরও আমি ওটাকে ব্যবহার করেছি।

—সেন্ট্রির মুখে বেঁধে রেখেছিলেন?

—কোন সেন্ট্রি! বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম।

—যে সেন্ট্রিকে আপনি হত্যা করেছেন?

—আমি হত্যা করেছি? বলেন কি? কী বলছেন আপনি?

একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লাম আমি।

স্মিত হাস্যে বললেন তিনি,—যা হয়েছে তাই বলছি। আপনার সহায়তা না পেলে ও আমাকে এতো বড় সর্বনাশ করে পালাতে পারতো না। আপনি তাকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেছেন।

মিলিটারী অফিসাররা কি সেকথা বিশ্বাস করেছেন?

—না, তাদের অন্যভাবে বুঝিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমার চোখে আপনি ধুলো দিতে পারেন নি। আমি ঠিকই ধরেছি। মুহূর্তে রুমালটা লুকিয়ে ফেলেছিলাম তাই। মরফিয়ার গন্ধ যাতে তাদের নাসিকায় প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য দ্রুত চলে এসেছিলাম এখানে। পুরো কাগজের খামের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলাম আলমারীতে। তাদের নজরেই পড়েনি।

—আপনাকে হাজার শুকরিয়া।

—কিন্তু রুমালটা দস্যুটার হাতে গেল কেমন করে? মরফিয়াও বা সে পেলো কোথায়?

—বিশ্বাস করুন স্যার। আমি কিছুই জানি না।

—ঘুম ভাংতে এতো দেরী হলো কেন?

—একটু বেশী রাতে ঘুমিয়েছিলাম।

—সেটাই তো আমার প্রশ্ন। কেন রাত জাগলেন আপনি?

—কয়েকটা চিঠি লিখলাম কি না!

ডাক্তার দুলারাম আর কথা বাড়ালেন না। একটু সিরিয়াস হয়ে বললেন,—সাবধান হয়ে কাজ করবেন। মনে রাখবেন এটা মিলিটারী হাসপাতাল। আজ থেকেই তারা সেণ্ট্রির সংখ্যা বাড়াবে। তারা হয় তো আমাদের গতিবিধির প্রতিও খেয়াল রাখবে। দরজা খুলে রেখে বাইরে যাবেন না। এখানকার রোগীদের মধ্যেও অনেকে স্পাইগিরি করে। পলাতক বেটা আপনার রুমাল ব্যবহার করে আমাদের বিপদে ফেলতে চেয়েছিল। মেজর যদি রুমাল দেখতে পেতেন কিংবা মরফিয়ার গন্ধ তার নাকে যেত তবে আমাদের কারো নিস্তার ছিল না।

—ঠিকই তো। মিলিটারী হাসপাতালে চাকরি করলেও এতসব বুঝি না আমি। এমন মারাত্মক বিপদের কথা শুনিনিও কোনোদিন। তবু রক্ষা যে, রুমালখানা আপনার চোখে পড়েছিল প্রথমে। ওটা হয় তো আমার চেম্বারের টেবিলেই ছিল। এখন থেকে সাবধান হয়ে চলতে হবে আমাকে। অপনিও স্যার সাহায্য করবেন এ ব্যাপারে। বললাম আমি।

—করবো। যান, এখন স্নান করে নেন। বিপদ কেটেছে বলে মনে হয়। চলে এলাম আমি তাড়াতাড়ি।

আর একটা বিপদের কথা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাত্র একটা মিনিটের জন্য সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।

হাসপাতালে আমার অবস্থিতির সংবাদ তখন দলের কর্মীদের গোচরিভূত হয়েছে। হাসপাতালের এমব্যুলেন্সের মুসলমান ড্রাইভারের মাধ্যমে সুযোগ মতো খবরাখবর পাই। তবে সিরিয়াস কোনো সংবাদ তারাও আমাকে দেয় না, তার মাধ্যমে আমিও পাঠাই না। মাসুদ এমনি সাদা চিঠি পাঠায় তার মাধ্যমে। আমরা পূর্বে একই হাসপাতালে একত্রে চাকরি করতাম—পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ছিল—ভালবাসা থাকাও বিচিত্র নয়। অন্ততঃ এমব্যুলেন্স ড্রাইভার তাই মনে করতো। সন্দেহ করতো না কেউ আমাদের।

একদিন মাসুদের প্রেম পত্রের সাথে এক টুকরো কাগজ এলো। সে জানিয়েছিল: রাত একটায় তোমার কক্ষের পিছনের জানালায় একজন ছদ্মবেশী মুক্তিসেনা যাবে। কোনো গোপন সংবাদ থাকলে তার হাতে দেবে। সপ্তাহে তিনদিন সে ওখানে যাবে। শনি, সোম ও বুধ। এখান থেকে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

খবর আমার কাছে একটা ছিল। প্রেরণের উপায় খুঁজছিলাম দু' দিন ধরে। মাসুদের চিঠি পেয়ে তাই বসে পড়লাম লিখতে।

সেদিন একজন পদস্থ সামরিক অফিসার এসেছিলেন হাসপাতালে বিশেষ কোনো কারণে। তিনি আমার সাথে সামান্যক্ষণ আলাপ করে আমার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হয়ে পড়েন।

ছাত্রী জীবনে মনে করতাম, শুধু ছাত্র যুবকরাই বুঝি সহজে মেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কাছে পেতে পাগল হয়ে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী কালে দেখেছি পুরুষদের সময় অসময় জ্ঞান থাকে না। সুন্দরী মেয়ের সামান্য সাহচর্যের জন্য তারা অনেক কিছু করতে পারে। পুরাকালে রাজা বাদশাদের ব্যাপারেও এমন অনেক কথা শুনেছি! কিন্তু হাসপাতালে চাকরী করতে গিয়ে মর্মে মর্মে যে ধারণা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা বললে সমাজ জীবনে আবদ্ধ কুমারীরা বিশ্বাস করতে পারবে না। নিজের মুখে সে সব কথা বলতেও বাধে।

যা বলছিলাম,—ভদ্রলোক আমার প্রতি এতো বেশী আসক্ত হয়ে পড়েন যে, দু ঘণ্টা ধরে তিনি আমার সাথে ছায়ার ন্যায় ঘুরতে থাকেন। সামরিক বিভাগে লৌহ মানব বলে পরিচিত এই উগ্র অফিসারটি আমার পিছনে পিছনে বেড টু বেড, এক ওয়ার্ড থেকে অন্য ওয়ার্ডে বাজারের ষাঁড়ের মতো ঘুরতে লাগলেন। ডাক্তার দুলারাম সব বুঝতে পেরেও কোনো প্রতিকার করতে পারলেন না। ভিতরে ভিতরে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। বুঝলাম, এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া আজ সম্ভব হবে না।

কতক্ষণ আর বিনা কাজে কাজের বাহানা করা যায়? ক্লান্ত হয়ে পড়লাম অবশেষে। নিয়তির উপর নিজেকে ছেড়ে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে

চললাম নিজ অফিস কক্ষে। তিনিও পিছু নিলেন .আমার। এদিকে অনেকক্ষণ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। তিনি সামনের চেয়ারটা আমার পার্শ্বে টেনে নিয়ে গা ঘেঁষে বসলেন। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগলো তার নাসিকা পথে। আমি বলির পাঁঠার মতো কাঁপছি। ঈশারা করে ডাকা সত্বেও ডাক্তার দুলারাম আমার কাছে আসেননি।

এতক্ষণে অফিসারটি মুখ খুললেন। বললেন,—আমি ভারতীয় বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন। আজও বিবাহ করিনি। তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

বললাম, - ভালো কথা। আমিও তোমাকে পছন্দ করি। আমার বাবার ঠিকানা দিচ্ছি। তাঁর সাথে যোগাযোগ করো।

আশান্বিত হয়ে লোকটা আরও কাছে সরে এলো। একান্ত হতে চাইল। বললো,—তোমার মত থাকলে আমি তা করে নিতে পারবো। আজ চলো না একটু শহর থেকে ঘুরে আসি!

বললাম, সে হয় না। রাত্রে আমার ডিউটি আছে। তুমি বরং আগামী ১লা তারিখে আসবে। ঐদিন আমার ছুটি থাকবে, বাইরে যাওয়া যাবে। প্রয়োজন হলে সারাদিন তোমার সাথে অতিবাহিত করতে পারবো।

ডাইরির পাতা উল্টালো নর পিশাচটি। তার পর বিমর্ষভাবে বললো,—তা হয় না লক্ষ্মীটি! ঐদিন আমাদের সমর মন্ত্রী চৌহান ও জেনারেল চৌধুরী আসবেন এক গোপন টুরে কারগিলে। আমাকে থাকতে হবে সেখানে। আসা সম্ভব নয়।

—তা হলে আমি দুঃখিত। পরে দেখা হবে আমাদের। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি নে। স্মিতহাস্যে বললাম তাকে।

সে চেয়ার ছেড়ে উঠলো আর দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললো, —আজকের প্রথম পরিচয়ের দিনটি স্মরণীয় হয়ে থাকুক না আমাদের! চলো না তোমার শোবার ঘরে।

দেহ আমার রাগে আর আক্রোশে থর থর করে কেঁপে উঠলো। বললাম, —তুমি না আমাকে বিয়ে করতে চাও! স্ত্রী করে ঘরে নিতে চাও? কি বলছ পাগলের মতো? আমাকে কুলটা পেয়েছ নাকি?

—ডার্লিং, ভুল বুঝ না.....কথা শেষ হলো না। অতর্কিতে প্রবেশ করলেন সে রুমে আর একজন সামরিক অফিসার। আমার প্রেমাসক্ত অফিসারটির বেপরোয়া ভাব দেখে তিনি গর্জন করে উঠলেন,

—কি করছো তুমি এখানে?

আগন্তুকের কণ্ঠস্বর শুনেই প্রেমিক প্রবর ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ছেড়ে দিলো আমাকে।

আগন্তুক অফিসারটি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে আদেশের স্বরে বললেন,

—এটেনশন। সোজা হয়ে দাঁড়ালো প্রেমিক অফিসারটি।

—কি করছিলে তুমি এখানে? কখন ফেরার কথা ছিল তোমার? চলে যাও—ইডিয়ট!

ভিজে বেড়ালের ন্যা প্রেমিক প্রবর নিষ্ক্রান্ত হলো আমার কক্ষ থেকে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি।

কিন্তু আরেক বিপদ যে তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল তা আমি অনুমান করতে পারিনি।

আগন্তুক অফিসারটি চলে গেলেন না। বসে পড়লেন আমার চেয়ারে। আমি ভদ্রতার খাতিরে তার পাশেরটায় উপবেশন করলাম। এবার আমার হৃদয়ে কিন্তু ভয়ের সঞ্চার হলো না। তাকে বেশ ভদ্র বলেই মনে হলো। সিগারেট টানতে টানতে গল্প করতে লাগলেন তিনি। সামরিক জীবন তার ভালো লাগে না। সমাজ বহির্ভূত সে জীবনে অর্থ থাকলেও স্বস্তি নেই। নিয়ম শৃংখলের কড়াকড়ি তার কাছে অসহ্য। ভদ্র ঘরের সন্তানের জন্য সে চাকরি কষ্টকর প্রভৃতি অনেক কথাই বললেন।

আমি হা হু করে সমর্থন করতে লাগলাম। আর বেরুবার জন্য সুযোগের অনুসন্ধানে রইলাম।

এক সময় তিনি বললেন,—ঐ অসভ্যটা আপনার পিছনেও লেগেছে না কি? ওকে নিয়ে পারা মুশকিল। কোনো সুযোগে যদি গ্রামের মধ্যে একবার প্রবেশ করতে পেরেছে তবে সুন্দরী মেয়েদের উপর

অত্যাচার না করে সে ফিরবে না। প্রত্যেক দিন দু চারটে কুকর্মের রিপোর্ট তার বিরুদ্ধে আসেই।

—আপনি না এলে আমিও হয়তো রেহাই পেতাম না তার কবল থেকে।

—সত্যিই তাই। বলেই তিনি দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। ভাবলাম, চলে যাচ্ছেন হয়তো। আমি চললাম তার পিছু পিছু। কিন্তু দরজায় গিয়ে তিনি বাইরে না বেরিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন নিজ হাতে। আমি বললাম,—কি করছেন? দরজা বন্ধ করছেন কেন?

—এমনি, কি হয়েছে তাতে?

—ন, কিছু হয়নি। তবে কিছুক্ষণ আগে আপনার সহকর্মী যা আরম্ভ করেছিলেন, তাতে—

—ও তো একটা ইডিয়ট। ওর কথা ছেড়ে দিন।

—ওর কথা ছেড়ে কার কথা ধরবো?

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে, আমি ঐ ইডিয়টটার হাত থেকে আপনাকে রক্ষা করেছি।

—আমি অকৃতজ্ঞ নই! সে জন্য আপনার প্রতি আজন্ম আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

—আজীবনের কথা বাদ দিন। আজকের মুহূর্তটা মনে রাখলেই চলবে। কৃতজ্ঞতাবোধ দেখালেই আমি খুশি হবো।

পাষণ্ডটার কথা শুনে আমার চীৎকার করতে ইচ্ছা হলো! লাভ যে তাতে কিছু হবে না তা আমার জানা ছিল। শেখ সাদীর একটা কবিতার ছয়টা চরণ আমার মনে পড়লো:

"একদা বাঘের কবলে পড়েছিল পথহারা ছাগ,
উদ্ধারি আনিল তারে বৃদ্ধ এক সাধু মহাভাগ।
সাঁঝের আঁধারে যবে ঢেকে গেল দিবসের আলো
অস্ত্রহাতে সাধু বাবা ছাগকে বলি করিতে গেল।
মুমূর্ষু পরাণে ছাগ কাঁদি' কয় চোখে লয়ে পানি
—বৃক হতে উদ্ধারিয়া বৃক পুনঃ সাজিলা আপনি

তবু শেষ চেষ্টা করার জন্য তাকে বসতে বললাম। কোনো প্রকার অসৌজন্য প্রকাশ করলাম না। কি যেন বলতে বলতে তিনি সরল বিশ্বাসে চেয়ারে উপবেশন করতে যাচ্ছেন এমন সময় পলাতক আসামীর ন্যায় আমি এক দৌড়ে চলে গেলাম দরজায়। দুহাতে দরজা খুলেই বেড়িয়ে পড়লাম বারান্দায়। অফিসারটির কর্তব্য স্থির করার আগেই আমি বাহির থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। উচ্চস্বরে বললাম,—এখন মিলিটারী হেড কোয়ার্টারে সংবাদ পাঠিয়ে দেই?

—না ডাক্তার, খুলে দিন। এমন দুষ্টুমি আর কোনদিন আমি করবো না। আমাকে বিশ্বাস করুন।

আজকের রাতটা এখানে আরামে ঘুমিয়ে থাকুন। কাল সকালে আবার দেখা হবে। চলতে চলতে বললাম,— বিদায় বন্ধু। বিদায়।

অফিসারটি ততোধিক চিৎকার করে বলতে লাগলেন—না ম্যাডাম, পাগলামি করেন না। বেশ শিক্ষা হয়েছে। আর কোনদিন যদি দুষ্টুমি করি তবে সেদিন আপনার যা ইচ্ছা তাই করবেন।

—ঠিক তো?

—তিন ঠিক।

দরজা খুলে দিলাম তখন। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন তিনি। আমিও সহাস্যে তাকে বিদায় দিলাম। তবে আবার আসার জন্য আর আমন্ত্রণ জানালাম না।

রাত তখন দশটা হয়ে গেছে।

মনে হলো সংগৃহীত সংবাদটা লিখে রাখা দরকার। কিন্তু পাঠাবো কার মারফত? ড্রাইভারের কাছে পাঠানো নিরাপদ নয়। তাছাড়া মানুষের কাছে পাঠিয়েও লাভ নেই। সেও হয় তো এ সংবাদ রাখে।

আজ বুধবার, ছদ্মবেশী মুক্তি যোদ্ধার আসার কথা আমার জানালায় রাত একটায়। তার হাতেই খবরটা দিতে চাইলাম।

হাসপাতালে সেদিন নাইট ডিউটি ছিল না। কক্ষে এসে শুয়ে পড়লাম বাতি নিবিয়ে। তখনও তিন ঘন্টা সময় আমার হাতে।

অতো রাত পর্যন্ত আলো জ্বেলে যদি কোনো কাজ করি তবে কারো নজরে পড়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। স্পাইদের উচিত নয় শত্রুপক্ষকে সন্দেহের অবকাশ দেওয়া।

আবার বাতি নিবিয়ে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকাও সম্ভব নয়। যে কোনো মুহূর্তে ঘুম এসে যেতে পারে।

কখনও শুয়ে কখনও বসে অতিবাহিত করলাম রাত সাড়ে বারোটা অবধি! তারপর পিছনের জানালা খুলে কাগজখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম দূর দিগন্তের দিকে নজর রেখে। কিন্তু কোনো মানুষের সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না, একটা বাজতে এক মিনিট আগেও।

দূরের ঘণ্টা থেকে একটা বাজার সংকেত ধ্বনিত হতেই একটা ছায়া মূর্তিকে দেখতে পেলাম হাসপাতালের অনতিদূরে অবস্থিত জঙ্গলের মধ্য থেকে আমার জানলার দিকে এগিয়ে আসছে। এতক্ষণে আমার আকুল প্রতীক্ষার অবসান হতে চললো। রাত জাগার সার্থকতা অনুভব করতে লাগলাম। একটু নড়ে-চড়ে দাঁড়ালাম আমি। ভাজকরা কাগজখান আরও ছোট করে ভাজ করতে লাগলাম।

ধীরে ধীরে ছায়া মূর্তিটা আমার খোলা জানলার কাছে এসে থামলো—হাত বাড়িয়ে দিলো উপরের দিকে। অমনি গুড়ুম গুড়ুম করে দুইটা গুলীর আওয়াজ রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমাকে সচেতন করে তুললো। তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়ালাম আড়ালে। একটা অস্ফুট চীৎকার আমার কানে ভেসে এলো। সাহায্যের জন্য আকুল আবেদনে ভরপুর সে চীৎকার। ডাক্তারী মন আমার সেবার জন্য বাইরে যেতে চাইল কিন্তু সাহস পেল না।

জানালার কাছেও যেতে পারলম না। এক অজানা ভীতি আমার সমস্ত দেহে চেপে বসলো। অসাড় হয়ে শুয়ে রইলাম বিছানায়। গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে করতে এক সময় সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে আহত লোকটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলো বলে মনে হলো।

কিছুক্ষণ পরে দুজন লোকের আগমন হলো সেখানে। অকথ্য ভাষায় তারা গালিগালাজ করতে লাগলো মৃত ব্যক্তিটির উদ্দেশ্যে। চোর কিংবা বদমাস বলে মনে করলো তাকে। এদিকে আমি এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে আমার বিপদের কথা চিন্তা করছিলাম। মনে হচ্ছিল তারা পূর্বেই আমাদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ অবগত হয়ে দূরে ওৎপেতে অপেক্ষা করছিল মুক্তি যোদ্ধার আগমন প্রতীক্ষায়। এবার আমার পালা। ওকে শেষ করে আসবে আমার কাছে। বন্দী করবে আমাকে, অত্যাচার চালাবে আমার দেহে সকল প্রকার গোপন সংবাদ আদায় করার চেষ্টা করবে। ধরা পড়ে যাবো সহজে, কারণ তখনও আমার হাতে সেই গুপ্ত সংবাদের কাগজখানি ছিল। দেশলাই জ্বালিয়ে তা পোড়ানোর উপায় নেই। আমি ঘুমাইনি জানতে পারলে তখনই প্রবেশ করবে তারা আমার কক্ষে। নিজকে রক্ষা করার আর উপায় থাকবে না তখন।

বেচারা মুক্তি সেনাটির জন্য দুঃখ হলো। তার জীবন আজ আমার সম্মুখেই শেষ হলো—ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও কিছু করতে পারলাম না আমি। তাকে বাঁচাতে গেলে অনেক বিপদের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে হতো।

বেশীক্ষণ চিন্তা করতে পারলাম না। আমার সেই খোলা জানালার কাছে মৃত দেহটার পাশে জীবন্ত মানুষের উপস্থিতির সাড়া পাবার পর পরই আমার দুটো শব্দ শ্রুত হলো।

ভয়ে বাথরুমে আশ্রয় নিতে ইচ্ছা হলো আমার। কিন্তু বিছানা থেকে উঠতে সাহস হলো না। আবার সেই করুণ মিনতি ও আর্তচিৎকার আমার কানে প্রবেশ করলো।

কিছুক্ষণ পরে তাও শূন্যে মিলিয়ে গেল। তিন তিনটি আহত রোগী আমার জানালার কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন জানিয়ে চীৎকার করলো। সামান্য চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হলো, আর আমি ডাক্তার হয়েও তাদের সাহায্য করতে পারলাম না। পারলাম না সামান্যতম সহানুভূতি জানাতেও।

বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হলো আমার।

সকালে মৃতদেহগুলি নিয়ে নানা জল্পনা কল্পনা চলতে লাগলো। প্রথম মৃতদেহটিকে কেউ চিনতে পারলো না। শেখ আবদুল্লার সমর্থক বলে অনুমান করলো তারা। কিন্তু কি কারণে হাসপাতালের জানালার সে কাছে এসেছিল, তাকে মারার পর নাইট গার্ডদের কে মারলো তা অনুমান করতে পারলো না কেউ। কেউ আমার কাছে কিছু জিজ্ঞেস না করলেও যতক্ষণ অনুসন্ধান চললো ততক্ষণ আমি স্বস্তি পেলাম না। বুকটা দুরু দুরু করতে লাগলো।

ডাক্তার দুলারাম কিন্তু ঠিকই ধরেছিলেন। বলেছিলেন, সারা রাত যে আপনার ঘুম হয়নি তা চোখ দেখলেই বোঝা যায়।

মৌনসম্মতি জানানো ছাড়া উপায় ছিলনা আমার। তিনি আপনা থেকে বললেন, তিন তিনটে মানুষ আহত হয়ে যার দরজায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে মরে তার কি কখনও ঘুম হতে পারে? বিশেষ করে সে যদি মহিলা হয়?

সে মন্তব্যেরও বিরোধিতা করলাম না।

কিন্তু আশ্চর্য হলাম, ডাক্তার দুলারাম ছাড়া এ মৃত্যু রহস্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামালো না। একটা তদন্ত পর্যন্ত হলো না।

আশ্চর্য হলেও তাতে আমি দুঃখিত হলাম না, কারণ কিছু একটা হলেই জড়িয়ে পড়তে হতো আমাকে। কেচোঁ তুলতে শেষে সাপ উঠে পড়তো। রেহাই পাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

দুঃখিত হলাম আমি অন্য কারণে।

বহু কষ্টে সংগৃহীত সংবাদটা পৌঁছে দিতে পারলাম না শরীফ ভাইয়ের কাছে। অথচ আমার চিঠি নেওয়ার জন্য এলো যে তাজা প্রাণটি সে অকালে ঝরে পড়লো আমারই জানলার কাছে। যারা তাকে হত্যা করলো তারাও মৃত্যুর হিমশীতল কোলে আশ্রয় নিলো। ভাবলাম, আর নয়, নিজ জীবনের ঝুকি নিয়ে এমন করে আর কাজ করবো না। কারণ সৃষ্টি করবো না দেশ উদ্ধারের নামে মানুষ হত্যার। এটা অন্যায়। আমুদের

কাছে প্রতিজ্ঞা করে ভুল করেছি অন্যায় করেছি, একজনকে পাবার জন্য, দেশকে স্বাধীন করার নামে এমনি করে হত্যাযজ্ঞে শরীক হয়ে। আর নয়।

॥ আট ॥

মুক্তি সেনাদের কর্মচাঞ্চল্য ও আক্রমণ পাল্টা আক্রমণ এমন ব্যাপক আকারে সারা অধিকৃত কাশ্মীরে আরম্ভ হলো যে, ভারত সরকার চিন্তিত হয়ে পড়লো। তারা আর তখন সমস্ত দোষ পাকিস্তান সরকারের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হতে পারলো না। প্রত্যেক দিন কোথাও না কোথাও মুক্তি সেনারা পুল উড়িয়ে দিতে লাগলো। সামরিক ঘাঁটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করতে লাগলো। জনসাধারণও তাদের সমর্থনে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুতে আরম্ভ করলো।

সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকা একটা ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হলো। ডোগরা পুলিশও যথেচ্ছা অত্যাচার চালাতে লাগলো নিরীহ জনগণের উপর। বেইজ্জতি করতে লাগলো গৃহবধু ও কুমারী মেয়েদের উপর। সর্বত্র একই অবস্থা বিরাজমান।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান সরকার ভারত বাহিনী কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রমের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। একে একে সাতটা সীমা লংঘনের অভিযোগ পাকিস্তানের পক্ষ থেকে উত্থাপন করা হয়েছিল। জাতিসংঘ ১৫ই জুলাই তারিখে তার সামরিক তত্ত্বাবধায়ক দল প্রেরণ করেছিলেন কাশ্মীর বর্ডারে।

তারা দোমাল, ভিম্বার ও অন্যান্য অঞ্চল সফর করে পাকিস্তানের অভিযোগের সত্যতা প্রত্যক্ষ করলো।

ঐ দিন কাশ্মীরের অন্যতম সংগ্রামী বন্দী নেতা মীর্জা আফজল বেগের রক্তের চাপের ভয়াবহতার সংবাদ খবরের কাগজে প্রকাশিত

হওয়ায় সমগ্র উপত্যাকায় আবার আগুন জ্বলে উঠলো। তাঁকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দেশের প্রতিটি প্রান্ত থেকে দাবী উত্থাপন করা হলো। মানষ সরকারী অফিস আদালতের উপর নির্বিবাদে হামলা চালাতে লাগলো।

স্বতন্ত্রদলের জেনারেল সেক্রেটারী মিঃ এম, আর, মাসানী শিলং থেকে এক আবেদনে বললেন,—ভারত সরকারের উচিত নয় স্বাধীনতাকামী জনগণের উপর অকথ্য অত্যাচার চালানো। তারা তাদের দাবীর যৌক্তিকতা প্রমাণিত করছে। সরকারেরও উচিত তাদের যুক্তি প্রদর্শন করা। অত্যাচার আর উৎপীড়ন দ্বারা কোনো মুক্তি পাগল জাতিকে প্রদমিত করা যায় না। একটা আপোষ মীমাংসা হওয়া দরকার।

কিন্তু কে শোনে কার কথা? ডোগরা পুলিশ তাদের অত্যাচারের মাত্রা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়েই চললো। সামরিক বাহিনীর লোকেরাও নতুন নতুন বাঙ্কার আর ট্রেঞ্চ খনন করতে লাগলো।

মোজাফারাবাদ এলাকায় চানকানদাইখ-এ তিনটি নতুন ঘাটি স্থাপন করলো ভারতীয় সৈন্যরা।

দেশে তখন এক ভয়াবহ খাদ্য সমস্যা চলছিল। হাট-বাজার থেকে উধাও হলো খাদ্যদ্রব্য। হাহাকার পড়ে গেল চতুর্দিকে।

ভুখামিছিল বের হলো সর্বত্র। ক্ষুধার্ত মানুষ লুটপাট করতে লাগলো খাদ্যের গুদাম। ডোগরা পুলিশ এসব মিছিলের উপর গুলী চালালো। যুবকদের বন্দী করলো।

আমাদের হিসাবে ২৭ জন মুক্তি যোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হলো, ১৬৭ জন হলো মারাত্মকভাবে আহত, আর বন্দী করে কারাগারে প্রেরিত হলো ৪১৯ জনের মতো। এর মধ্যে পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা যতো ছিল তার চাইতে বেশী ছিল দেশীয় যুবক। পুলিশ বাহিনী ভয়-ভীতি আর সন্ত্রাসের সৃষ্টি করতে চাইল সর্বত্র।

কিন্তু তাতেও প্রদমিত করা গেল না তাদের। আঘাত আর অত্যাচারে দুর্বলরা সবল হয়, বাধা প্রদানে দুর্বার হয় তাদের আন্দোলন, অপ্রতিরোধ্য

হয় তাদের গতি আর আত্মত্যাগ। কাশ্মীরীদেরও তাই হলো। ডোগরা পুলিশ আর ভারতীয় মিলিটারী হাজার চেষ্টা করেও প্রতিহত করতে পারলো না তাদেরকে জীবন-পণ সংগ্রামের পথ থেকে।

ওদিকে মীর্জা আফজল বেগের শারীরিক অবস্থাও দিন দিন খারাপের দিকে যেতে লাগলো। মানুষ আরও ক্ষেপে গেল। চারিদিকে শুধু আন্দোলন, হরতাল হত্যা, রাহাজানি আর সংগ্রাম চলতে লাগলো। প্রত্যেক দিনই কিছু কিছু সামরিক রসদ লুণ্ঠন; কয়েজন মিলিটারী অফিসার গুম, আর দু'একটি গোপন আক্রমণের খবর শ্রুতিগোচর হতো।

অবস্থা এমন বেগতিক দেখে ভারত সরকার সকল দোষ পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু ২২শে জুলাই জাতিসংঘের তদন্তকারীরা স্বচক্ষে দেখলেন যে, ভিম্বর, কোটলী, রাওয়ালকোট, দোমেল প্রভৃতি সেক্টরে ভারতীয় বাহিনী প্রথমে পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন।

খবরের কাগজের সংবাদ অধ্যয়ন করা ব্যতীত আমাদের আর কিছু করণীয় ছিল না তখন। যারা আহত হয়ে হাসপাতালে আসতো তাদের ভালো করে চিকিৎসা করতাম। যতোদূর সম্ভব অতিরিক্ত সেবা, ওষুধ ও যত্ন দিয়ে তাদের সারিয়ে তুলতাম।

২৫শে জুলাই তারিখের একটা খবর আমাকে আশান্বিত করে তুললো। দেখলাম তাতে বেরিয়েছে: আকালী দলের নেতা মাস্টার তারা সিং পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন,—অধিকৃত কাশ্মীরের অধিবাসীকে সুদীর্ঘ ১৭ বছরের অবিরাম প্রচেষ্টায় যখন স্বমতে আনয়ন করা যায়নি তখন সে চেষ্টা থেকে আমাদের নিবৃত্ত থাকা উচিত। ভারত সরকারের উচিত তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। সুদীর্ঘ ১৭ বছরে ভারত সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় হয়েছে। বহু গোলাগুলী নষ্ট হয়েছে, অগণন কাশ্মীরবাসীকে বছরের পর বছর কারা প্রাচীরের অন্তরালে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, তবুও যখন তাদের শান্ত করা যায়নি। এতদিনেও যখন আমাদের সরকারকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, কাশ্মীর

উপত্যকার অধিবাসীরা পাকিস্তানের ভক্ত,—তারা পাকিস্তানের আনুগত্য স্বীকার করে তখন আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের উচিত তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া।

২৭ তারিখে মাস্টার তারা সিংহের বিবৃতির রেশ ধরে শ্রীপ্রকাশ 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেসে' এক সুন্দর যুক্তিতর্কপূর্ণ প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি বললেন—আর বিলম্ব না করে আমাদের জাতীয় সরকারের উচিত, পাকিস্তানের সাথে সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধানে এগিয়ে আসা। সীমান্ত সংঘর্ষ পরিহার করতে হলে "বর্ডার প্রব্লেমস"-এর অবসান ঘটাতে হবে, এবং একগুয়ে হয়ে বসে থাকলে চলবে না। কাশ্মীরের সমস্যা স্বীকার করে নিতে হবে—তার উপযুক্ত ও সম্মানজনক সমাধানও বের করতে হবে। 'কাশ্মীর কোনো সমস্যা নয়, উহা আমাদের অঙ্গরাজ্য তার সম্বন্ধে কথা বলা মানে আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা' প্রভৃতি শ্লোগান বন্ধ করতে হবে। পাকিস্তানকে একটা পক্ষ স্বীকার করে নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে, অন্যথায় যুগের পর যুগ এভাবে চলতে দেওয়া যেতে পারে না। চলবেও না। ১৭ বছর পরে কাশ্মীরবাসী নতুন করে যেভাবে জেগে উঠেছে তাতে আমাদের সরকারকে এগিয়ে আসতেই হবে।

এইভাবে একের পর এক ভারতীয় নেতা, চিন্তাবিদ ও শান্তিপ্রিয় মানুষ ভারত সরকারকে বাস্তব পন্থা গ্রহণ করার জন্য উপদেশ দিতে লাগলেন। আমার মনে বেশ আশার সঞ্চার হলো।

সাংবাদিকরাও প্রধান মন্ত্রী সাদিককে নাজেহাল করে ছাড়লেন। তারা ২৯শে জুলাই তাকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারী বলে আখ্যায়িত করেছেন অথচ কাশ্মীরের রাজনৈতিক নেতাদের বন্দী করেছেন। তারা সংখ্যায় কত?'

—তিন শতের মতো রাজনৈতিক বন্দী এখানে বিভিন্ন কারাগারে আটক রয়েছেন।

—কাশ্মীরবাসী যদি আপনাদের শাসনে সন্তুষ্ট থাকে তবে তাঁদের অনর্থক আটক রাখেন কেন?

— তারা সব পাকিস্তানের গুপ্তচর।

জনৈক সাংবাদিক মন্তব্য করলেন,— যারা আপনার খাজনা দেয়, যারা পুরুষানুক্রমে কাশ্মীরের অধিবাসী, যারা আপনার ভোটার লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত তারা যদি পাকিস্তানের গুপ্তচর হয় তবে কি আপনার স্বীকার করা হলো না যে, কাশ্মীরও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত?

রুক্ষ মেজাজে তিনি বললেন,— না। আমি বন্দীদের কথা বোঝাতে চেয়েছি।

—আমরাও তো তাদের কথাই বলছি।

—আপনাদের সাথে আমি অনর্থক তর্ক করতে চাইনা।

সাংবাদিকরা প্রধান মন্ত্রীর রাগ দেখে আর কথা বাড়ালেন না কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার হলো যে কাশ্মীর সরকার থেকে আরম্ভ করে ভারত সরকার পর্যন্ত মুক্তি যোদ্ধাদের ভয়ে দস্তুরমতো ভীত হয়ে পড়েছেন।

৬ই আগষ্ট। আমাদের নেতা কাশ্মীর শার্দুল শেখ আব্দুল্লাহ প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর নিকট এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন: হয় আমার উপর থেকে কড়াকড়ি হ্রাস করা হোক অন্যথায় আমার বাড়ীর নিকটবর্তী কোনো জেলে প্রেরণ করা হোক। আমি ভয়ানক অসুস্থ।

ভারত সরকার কান দিলেন না তাঁর আবেদনে। কিন্তু ঐদিনই মীর্জা আফজল বেগকে নতুন দিল্লী থেকে শ্রীনগরে প্রেরণ করা হলো।

বিকালে হযরতবালের প্রকাশ্য ময়দানে এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশ হলো। সেখানে আবার নতুন করে কাশ্মীরবাসী শপথ নিলো মুক্তি সংগ্রামে আর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের আন্দোলন দুর্বার গতিতে চালিয়ে যাবার, এবং ৯ই আগষ্টের মধ্যে যদি শেখ আব্দুল্লাহকে মুক্তি দেওয়া না হয় তবে সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় আগুন জ্বলে উঠবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীতে। পালিত হবে হরতাল।

বারো বছর আগে ঐ ৯ই আগষ্ট অন্যায়ভাবে তদানিন্তন প্রধান মন্ত্রী শেখ আব্দুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে জেলে প্রেরণ করা হয়েছিল।

মাওলানা মাসুদ হযরতবালের ময়দানে প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, — কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর অত্যাচারের স্টীম রুলার চালান হচ্ছে। স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ক্রমান্বয়ে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে। বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তাদের পত্র-পত্রিকা, রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে তাদের কণ্ঠস্বরকে।'

'তাই আমরা আজকের এই পবিত্র দিনে ভারত সরকারকে প্রকাশ্যে জানিয়ে দিতে চাই যে, যদি তারা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না করেন, যদি ৯ই তারিখের পূর্বে আমাদের প্রিয়নেতা আব্দুল্লাহ আর আফজল বেগকে মুক্তি দেওয়া না হয় তবে আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সমিতি সমগ্র উপত্যকায় পূর্ণ হরতাল পালন করবে।'

মাওলানা মাসুদের সতর্কবাণী ভারত সরকারের টনক নড়াতে পারলো না কিন্তু মুক্তি যোদ্ধাদের নতুন করে সজাগ করে তুললো।

ড্রাইভারের মারফত আমার কাছে নতুন চিঠি এলো। মাসুদের নিকট থেকে আসেনি সে পত্র। তাতে লেখা ছিল: হাসপাতালের কড়া পাহারার মধ্যে যাতায়াত করা আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য। আপনি যে কোনো অজুহাতে পৃথক বাসার ব্যবস্থা করুন। সেখান থেকেই আমাদের আদান প্রদানের কাজ চলবে। বৃহত্তর পরিকল্পনায় আমরা হাত দিচ্ছি।

আদেশনামা তো আসলো কিন্তু তা কার্যকর করবো কেমন করে? বেশ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম!

বহু চিন্তা-ভাবনা করলাম কিন্তু কোনো কিণারা করতে পারলাম না।

কথায় কথায় একদিন পরিকল্পনাটা পেশ করলাম ডাক্তার দুলারামের কাছে। বললাম,—'মিলিটারী অফিসারগণ যেভাবে আমার পিছনে লেগেছে, আপনিও যেমন অসহায় হয়ে পড়েছেন তাতে হাসপাতাল থেকে বাস গুটানো ছাড়া উপায়ন্তর দেখছি না। আপনি বরং আমার বাইরে অবস্থানের ব্যবস্থা করুন।'

— তা কেমন করে সম্ভব?

—আপনি বাইরে থাকেন কেমন করে ?

—এখানে ফ্যামিলি কোয়ার্টার নাই বলেই তো তা সম্ভব হয়েছে।

—আমার কোয়ার্টারটাও তো বাসের জন্য নয়?

—নয় ঠিকই, তবু তো আপনি প্রথম থেকে বাস করে আসছেন সেখানে

—সেটা আমার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। কিন্তু এখন যেভাবে সামরিক বিভাগের অফিসাররা আমার কাছে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করেছেন এবং ন্যাক্কারজনক ব্যবহার করছেন তাতে চব্বিশ ঘণ্টা এখানে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। নিরাপত্তার দিক থেকেও সেটা অরক্ষণীয়।

ডাক্তার দুলারাম আমার অসুবিধা অনুধাবন করতে পারলেন বলে মনে হলো, তবু তিনি আপত্তির সুরে বললেন,—এখানে আমি আছি, গার্ড আছে অন্যান্য লোকজনও রয়েছে। কিন্তু বাসায় গেলে তো আপনি অরক্ষিত হয়ে পড়বেন ?

—তবুও বোধ হয় রক্ষা পাবো, দরকার হলে আমার বাবাকে আনিয়ে নেবো।

অনিচ্ছা সত্তেও ডাক্তার দুলারাম সম্মতি প্রদান করলেন। বললেন, একটা ভালো বাসা নেবেন আর নেবেন একজন সবল দারোয়ান। আমিও মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নেবো।

— ধন্যবাদ আপনাকে! বাসা আমি একটা ঠিকও করেছি। বড় বাড়ীর নিচের তলায় দুটো রুম ভাড়া করেছি। আশে পাশে, সামনে, পিছনে বিস্তর লোকের বাস। উপরেও বাড়ীওয়ালা অবস্থান করেন। এখন একটা ভালো দারোয়ান পেলেই আমি নিরাপদ হতে পারি।

—দেখুন : যা ভালো মনে করেন তাই করুন, তবে এখানে যেদিন নাইট ডিউটি পড়বে সেদিন কি করবেন ?

—হাসপাতালের এমব্যুলেন্স যদি আমাকে দিয়ে আসে তবে অসুবিধা হবার কথা নয়! এটুকু নিশ্চয় আপনি করবেন।

—সে করা যাবে।

অনেক কষ্টে সম্মতি আদায় করলাম আমার বস ডাক্তার দুলারামের নিকট থেকে।

ঘাম দিয়ে জ্বর গেল যেন আমার। মনটা বেশ হালকা হলো।

পাঁচ তারিখের রাত্রেই নতুন বাসস্থানে চলে গেলাম আমি। ভোর সাতটায় দরজা খুলতেই দেখি একজন ভিখারীর মতো লোক আমার বারান্দায় থামে হেলান দিয়ে বসে আছে। আমাকে দেখেই সে উঠে দাঁড়ালো এবং নমস্কার করলো।

প্রতি নমস্কার করে প্রশ্ন করলাম,—কাকে চাও তুমি?

—আপনার কাছে এসেছি দিদি?

—আমার কাছে? কেন? সাহায্য চাও?

—না। ভিক্ষা আমি করি না কাজ করে খাই। ও পাড়ায় এক বাবায় কাজ করতাম। বাবু বদলী হয়ে গেলেন বলে আমাকে আবার কাজের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। শুনলাম, আপনার এক জন লোকের দরকার।

—কার কাছে শুনলে?

আমার প্রশ্ন শুনে লোকটা যেন ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বললো,—ঐখানে একজন লোক বললো। কেন, আপনার লোকের দরকার নেই না কি?

—আছে, তবে অপরিচিত কাউকে রাখতে চাইনে। দেখেশুনে রাখতে হবে। তুমি বরং পরে খোঁজ নিও।

লোকটা বিষন্নমুখে চলে যাচ্ছিল। কি মনে করে আবার ফিরে এসে বললো,—আপনি হাসপাতালে কাজ করেন না?

—করি? কেন? এ সবে তোমার কি প্রয়োজন?

বেয়াদবের মতো আবার প্রশ্ন করলো,—আপনি কি ব্রাহ্মণ?

—হ্যা। তুমি?

—আমিও তাই। দেখুন, আপনার কাজের জন্য আমার চাইতে ভালো লোক আপনি পাবেন না। বেতনও বেশী নেবো না।

—বললাম তো. পরে খোঁজ নিও।

সে ভয়ানক নাছোড় বান্দা। আবার বললো,—এখন দিনকাল খারাপ তাই ভয় লাগে। আমাকে রাখলে কিন্তু আপনি নিশ্চিত হতে পারতেন।

- আচ্ছা সে দেখা যাবে। তুমি বরং দুপুর একটায় হাসপাতালে যাবে। সেখানেই কথাবার্তা হবে।

তবু সে গেল না। নাছোড় বান্দার মতো দাঁড়িয়ে রইল। বাধ্য হয়ে প্রশ্ন করলাম,—পাহারা দিতে জানো? মানে দারোয়ানের কাজ করতে পারবে?

—সব পারি আমি। দরকার হলে যুদ্ধ করতেও পারি।

—তুমি তো সাংঘাতিক লোক হে।—হেসে ফেললাম আমি।

লোকটা যেন বেশ লজ্জা পেয়েছে এমনি ভাব দেখিয়ে বললো,

—রাখবেন দিদি আমাকে। অন্ততঃ দুটো দিন রেখে দেখুন না। পছন্দ না হলে তাড়িয়ে দেবেন।

—আচ্ছা ঠিক আছে, থাকো। তোমার নামটা তো বললে না হে।

—'প্রতাপ' নাম আমার। বললো লোকটি।

আধ ঘণ্টার পরিশ্রমেই সে সুন্দর করে গুছিয়ে নিলো সংসারটা। খাদ্যদ্রব্য কিছুই কেনা হয়নি। নাস্তা তৈরী করা সম্ভব হলো না তাই। পাঁচটা টাকা দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম দোকানে নাস্তা আনার জন্য। ভাবলাম, টাকা কয়টা নিয়ে সরে পড়বে না তো?

কিন্তু আমার সন্দেহ ভঞ্জন করে প্রতাপ প্রত্যাবর্তন করলো। নিয়ে এলো সকালের নাস্তা।

সারাদিন ডিউটি ছিল না আমার। বাজারে পাঠালাম তাকে প্রয়োজনীয় সওদাপাতির জন্য। অল্পক্ষণেই ফিরে এলো সে। রান্নাবান্নার কাজে লেগে গেল বলার আগেই। বেশ ভালো লাগলো লোকটাকে।

বিকেলে ডিউটি না থাকলেও গেলাম হাসপাতালে। সব কথা বললাম ডাক্তার দুলারামকে। তিনি সব শুনে তো হেসে খুন। বললেন,—চুরিটুরি করে পালাবে না তো?

—না, কাশ্মীরের মানুষ বিশ্বাসঘাতক নয়। সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা যায় না।

সন্ধার দিকে ফিরে এলাম বাসায়। দেখলাম সে রান্নাঘরে চোখ কান পুড়িয়ে খাবার তৈরী করছে।

একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতেই সে এসে দাঁড়ালো আমার পায়ের কাছে। পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজের টুকরো বের করে আমাকে হাতে দিয়ে বললো,

—দিদি একটা লোক এসেছিল আপনার খোঁজে। হাসপাতালে গিয়েছেন শুনে এই কাগজখানা আমার কাছে দিয়ে বললো; লেডী ডাক্তারের কাছে দেবে। অন্য কেউ দেখে না যেন।

—কই, দেখি দেখি। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। কোড ল্যাংগুয়েজের চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। দেখলাম সাংঘাতিক খবর পরিবেশিত হয়েছে তাতে। পুলকে মন ভরে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে প্রশ্ন জাগলো,—কিন্তু কোন নির্বোধের হাতে শরীফ ভাই এমন মারাত্মক সংবাদ পাঠালেন! একটা খাম করে অন্ততঃ দেওয়া উচিত ছিল। আর কারো হাতে যদি পড়তো তবে আমার অবস্থা কী হতো? কোর্ট মার্শাল হতো নিশ্চয় আমার। খোদার কাছে হাজার শুকর যে, তা হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে এমন না করে তার জন্য সাবধান করে দেওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাবো তাকে? আবার হয় তো আসবে, কিন্তু তখন যদি আমি বাসায় না থাকি? যদি ডিউটিতে থাকি? প্রতাপকে নিশ্চয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত হবে না।

প্রতাপ তখনও আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হয় তো ধরে নিয়েছিল যে, আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। মুখ তুলে বললাম,—লোকটা কিছু বলে গেছে?

—না। শুধু কাগজখানা দিয়ে বললো, আর কেউ যেন দেখে না তোমার দিদির হাতেই দেবে।

—আবার আসবে কিনা কিছু বলেনি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—কাল আসবে হয় তো।

—আচ্ছা তুমি কাজে যাও।

বিদায় করলাম প্রতাপ কে।

বারবার করে তিনবার পড়লাম চিঠিখানি। মাত্র কয়েকটি কথা 'জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কাশ্মীর উপত্যকায় একটা স্বাধীন সরকারও গঠন করেছি আমরা। নতুন রেডিও সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে প্রচার কার্য চালানো হবে। শট ও মিডিয়ম দু'ই ওয়েভে প্রচারিত হবে আমাদের ঘোষণা। উপত্যকার সর্বত্র আমাদের বাহিনী প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর ক্ষমতা হবে না তাদের দমন করা—রেডিও সেন্টারও তারা আবিষ্কার করতে পারবে না কিছুতেই।

এ সময়ে যে কোনো উপায়ে বর্ডারের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের লোক সময় মতো ছদ্মবেশে যাবে আপনার কাছে।'

চিঠিটা পড়া শেষ হইতেই বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস মনের অজান্তে বেরিয়ে এলো। মনে হলো, ঠিক সময় হাসপাতাল ছেড়ে বাধা নিয়েছি। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করবো কেমন করে?

হাসপাতালে বাস করলেই বরং তাতে সুবিধা হতো।

যাক, যা হয়নি তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। যা হতে পারে এবং যা করতে হবে তাই নিয়ে চিন্তা করাই যুক্তিসংগত।

শুয়ে থাকা আর হলো না দেশলাইয়ের কাঠি জেলে কাগজখানা পুড়িয়ে ফেললাম। ছাইগুলিও ফেলে দিলাম জানালা পথে।

৭ই আগস্ট অতিবাহিত হলো নির্ঝঞ্ঝাটে। না পেলাম কোনো খবর, না দিতে পারলাম কোনো গোপন সংবাদ। শুধু হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই প্রতাপ কাছে এসে বললো—লোকটা আবার এসেছিল আপনার কাছে, তার নাকি কি পাওনা আছে। তাগাদা করে গেল।

আমি বললাম,—ও কিছু না, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সময় হলে আমিই দিয়ে দেবো।

—না, কাশ্মীরের মানুষ বিশ্বাসঘাতক নয়। সরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তারা যায় না।

সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলাম বাসায়। দেখলাম সে রান্নাঘরে চোখ কান পুড়িয়ে খাবার তৈরী করছে।

একটু বিশ্রাম নেবার জন্য বিছানায় দেহ এলিয়ে দিতেই সে এসে দাঁড়ালো আমার পায়ের কাছে। পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজের টুকরো বের করে আমাকে হাতে দিয়ে বললো,

—দিদি একটা লোক এসেছিল আপনার খোঁজে। হাসপাতালে গিয়েছেন শুনে এই কাগজখানা আমার কাছে দিয়ে বললো; লেডী ডাক্তারের কাছে দেবে। অন্য কেউ দেখে না যেন।

—কই, দেখি দেখি। ব্যস্ত হয়ে পড়লাম আমি। কোড ল্যাংগুয়েজের চিঠি। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেললাম। দেখলাম সাংঘাতিক খবর পরিবেশিত হয়েছে তাতে। পুলকে মন ভরে গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে মনে প্রশ্ন জাগলো,—কিন্তু কোন নির্বোধের হাতে শরীফ ভাই এমন মারাত্মক সংবাদ পাঠালেন! একটা খাম করে অন্ততঃ দেওয়া উচিত ছিল। আর কারো হাতে যদি পড়তো তবে আমার অবস্থা কী হতো? কোর্ট মার্শাল হতো নিশ্চয় আমার। খোদার কাছে হাজার শুকর যে, তা হয়নি। ভবিষ্যতে যাতে এমন না করে তার জন্য সাবধান করে দেওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় পাবো তাকে? আবার হয় তো আসবে, কিন্তু তখন যদি আমি বাসায় না থাকি? যদি ডিউটিতে থাকি? প্রতাপকে নিশ্চয় এ সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত হবে না।

প্রতাপ তখনও আমার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে হয় তো ধরে নিয়েছিল যে, আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করবো। মুখ তুলে বললাম,—লোকটা কিছু বলে গেছে?

—না। শুধু কাগজখানা দিয়ে বললো, আর কেউ যেন দেখে না তোমার দিদির হাতেই দেবে।

—আবার আসবে কিনা কিছু বলেনি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—কাল আসবে হয় তো।

—আচ্ছা তুমি কাজে যাও।

বিদায় করলাম প্রতাপ কে।

বারবার করে তিনবার পড়লাম চিঠিখানি। মাত্র কয়েকটি কথা 'জয় আমাদের সুনিশ্চিত। কাশ্মীর উপত্যকায় একটা স্বাধীন সরকারও গঠন করেছি আমরা। নতুন রেডিও সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে সেখান থেকে প্রচার কার্য চালানো হবে। শট ও মিডিয়ম দু-ই ওয়েভে প্রচারিত হবে আমাদের ঘোষণা। উপত্যকার সর্বত্র আমাদের বাহিনী প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। ভারতীয় বাহিনীর ক্ষমতা হবে না তাদের দমন করা—রেডিও সেন্টারও তারা আবিষ্কার করতে পারবে না কিছুতেই।

এ সময়ে যে কোনো উপায়ে বর্ডারের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে হবে। আমাদের লোক সময় মতো ছদ্মবেশে যাবে আপনার কাছে।'

চিঠিটা পড়া শেষ হইতেই বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস মনের অজান্তে বেরিয়ে এলো। মনে হলো, ঠিক সময় হাসপাতাল ছেড়ে বাধা নিয়েছি। কিন্তু সংবাদ সংগ্রহ করবো কেমন করে?
হাসপাতালে বাস করলেই বরং তাতে সুবিধা হতো।

যাক, যা হয়নি তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। যা হতে পারে এবং যা করতে হবে তাই নিয়ে চিন্তা করাই যুক্তিসংগত।

শুয়ে থাকা আর হলো না দেশলাইয়ের কাঠি জেলে কাগজখানা পুড়িয়ে ফেললাম। ছাইগুলিও ফেলে দিলাম জানালা পথে।

৭ই আগস্ট অতিবাহিত হলো নির্ঝঞ্ঝাটে। না পেলাম কোনো খবর, না দিতে পারলাম কোনো গোপন সংবাদ। শুধু হাসপাতাল থেকে ফিরে এলেই প্রতাপ কাছে এসে বললো—লোকটা আবার এসেছিল আপনার কাছে, তার নাকি কি পাওনা আছে। তাগাদা করে গেল।

আমি বললাম,—ও কিছু না, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। সময় হলে আমিই দিয়ে দেবো।

সে বিনয়ের সাথে বললো,—আপনি আমার কাছে রেখে যাবেন দিদি। হেসে বললাম,—তার দরকার হবে না।

—আচ্ছা, বলে প্রতাপ চলে গেল তার কাজে।

কিন্তু আমি ভাবলাম আকাশ পাতাল। কোথায় সংবাদ পাই? কেমন করে যোগাড় করি? মিলিটারী অফিসাররাও কেউ আসে না এখন আমার কাছে। হাসপাতালে সেই অঘটন ঘটার পর থেকে তারাও যেন সাবধান হয়ে গেছে।

৮ই তারিখে সকালে রেডিও খুলতেই প্রথমে যে টিউন শ্রুতিগোচর হলো তা আমার দেহ-মনে এক নতুন শিহরণ জাগাল।

রেডিওয় বারবার প্রচারিত হতে থাকলো নতুন খবর। সেণ্টারটাও নতুন। স্টেশনের নাম ঘোষিত হলো 'সদা-এ-কাশ্মীর'।

সদা-এ-কাশ্মীর থেকে প্রচারিত হলো: অধিকৃত কাশ্মীর ভারতীয় নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছে। সাদিক সরকারকে অপসারণ করা হয়েছে। একটা বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছে সমগ্র কাশ্মীরে। সারা বিশ্বের প্রতি আমাদের আরজ, তারা যেন আমাদের সরকারকে স্বীকৃতি দান করেন অচিরে। ভারত সরকারকে বাধ্য করেন কাশ্মীর উপত্যকা থেকে তাদের সৈন্যবাহিনীকে সরিয়ে নিতে। অন্যথায় বল প্রয়োগ করেই আমরা তাদেরে দেশ থেকে বিতাড়িত করবো। কাশ্মীর আমাদের, তার পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদেরই। তাকে আভ্যন্তরীণ ও বহির্শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করার কর্তব্যও আমরা পালন করতে প্রস্তুত।

ভরত সরকার তার নয়া দিল্লীর রেডিও মারফত সদা-এ-কাশ্মীরের অবস্থিতি এবং বিপ্লবী সরকারের অস্তিত্বের কথা বারবার অস্বীকার করতে লাগলো। তারা এটাকে পাকিস্তানের একটা নয়া চাল হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে প্রতিভাত করার প্রচেষ্টা চালালো।

এইদিন রাত ১২টা পর্যন্ত সদা-এ-কাশ্মীর তার প্রচারণী অব্যাহত ভাবে চালিয়ে গেল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবের বিপুল ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হলো। কয়েকটি সামরিক ছাউনিতেও গুপ্ত আক্রমণ

পরিচালনা করলো। সামরিক ঘাঁটির আশেপাশের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পুলের বিস্তর ক্ষতিসাধনও করতে সক্ষম হলো মুক্তি সেনারা।

কিন্তু আমি কোনো নতুন সংবাদ সংগ্রহ করতে পারলাম না। সন্ধ্যায় বাসায় প্রত্যাবর্তন করতেই প্রতাপ সেই একই সংবাদের পুনরাবৃত্তি করলো। বুঝলাম লোকটা নতুন কোনো খবর পাবার আশায় সেদিনও এসেছিল।

৯ই আগস্ট। রেডিও খুলেই সদা-এ-কাশ্মীরের প্রচার শুনতে পেলাম। তারা পরিষ্কার ভাষায় জনসাধারণকে জানিয়ে দিলো: এখন থেকে অন্য কোনো সরকারের ন্যায়সঙ্গত অধিকার নেই কোনো প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা আদায় করার। বিপ্লবী কাউন্সিল অফিসেই কাশ্মীরবাসীকে খাজনা ও ট্যাক্স প্রদান করতে হবে।

সদা-এ-কাশ্মীর শুধু জনসাধারণের কাছে আবেদন করেই ক্ষান্ত হলো না। সরকারী কর্মচারীদেরও আদেশ প্রদান করলো নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে এবং তাদের আদেশ নিষেধ মোতাবেক কার্য পরিচালনা করতে।

বিভিন্ন স্থানে মানুষ দলে দলে বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠিত অফিসে স্বেচ্ছায় গমন করে খাজনা প্রদান করছে বলেও সদা-এ-কাশ্মীর রেডিওর সন্ধ্যার সংবাদে জানা গেল।

আট তারিখে তো ভারত সরকার কাশ্মীরে বিপ্লবী সরকার ও সদা-এ-কাশ্মীরের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেছিল কিন্তু সমগ্র উপত্যকায় একদিনে এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, স্বীকার করা তো দূরের কথা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী অল্প সময়ের ব্যবধানে দুবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার জরুরী বৈঠকের ব্যবস্থা করলেন। বিস্তারিত আলোচনা হলো সমগ্র পরিস্থিতির উপর। দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তারা। কয়েক ডিভিশন নতুন সৈন্য প্রেরিত হলো কাশ্মীরে।

পরদিন হাসপাতালে গিয়ে শুনলাম, একজন সাংবাদিক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। প্রথমে মনটা ছ্যাৎ করে উঠলেও নিজেকে সামলে নিয়ে অফিস কক্ষে আসতে বললাম। আমার অফিস রুমে এসে সে দু' চার কথা বলার পরই নিজের পরিচয় প্রদান করলো। বললো,— ম্যাডাম, আপনাকে গোপন করে লাভ নেই। গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা আমার কাজ। আসলে আমি সাংবাদিক নই।

—কেমন? বোকার মতো জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—ভারত সরকার কিছু সংখ্যক গোয়েন্দা পুলিশ নতুন ভাবে আমদানি করেছেন এখানে। আমি তাদের অন্যতম। আমাদের কাজ হলো বিভিন্ন স্থানে ঘুরে মুক্তি সংগ্রামীদের গোপন পরিকল্পনার সংবাদ সংগ্রহ করে তা পূর্বাহ্নে সামরিক বাহিনীর হেড কোয়ার্টারে প্রেরণ করা।

—বেশ তো, করুন না। তা আমার কাছে কেন?

একটু বিরক্ত হয়ে বললাম আমি। কিন্তু মনে মনে বললাম,— ভালই হলো দেখছি। আমার দিয়ে তার কোনো উপকার হোক আর না হোক তাকে দিয়ে আমার বেশ লাভ হবে। যেমন নারী ঘেষা সে একটু আস্কারা দিলেই অনেক গোপন খবর তার নিকট থেকে আদায় করা সম্ভব হবে।

ভদ্রলোক আরও গায়ের কাছে সরে এসে একান্ত ঘনিষ্ট হয়ে বসে বললেন, - দেখুন ম্যাডাম। দিন দিন আমি অকেজো প্রমাণিত হচ্ছি। দেশের সর্বত্র পরিকল্পনা মোতাবেক মুক্তি যোদ্ধারা বিপুল পরিমাণ ক্ষতি করে চলেছে অথচ আমি একটা সংবাদও পূর্বাহ্নে সংগ্রহ করতে পারছি না। চাকরি থাকবে কেন আমার, বলুন?

—আপনার অক্ষমতার কি আমি দায়ী?

দাঁত দিয়ে জিব কাটলেন ভদ্রলোক। বললেন,—রাম রাম। আমি কি আপনাকে দায়ী করছি নাকি?

— তবে কী?

—আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে ম্যাডাম। আপনার মতো সুন্দরী মেয়েরা অনেক কিছু করতে পারে। আপনি যদি আমাকে

একটু সাহায্য করেন তবে আমি বেঁচে যাই। একটা সংবাদ অন্ততঃ আমাকে সংগ্রহ করতে হবে দু'দিনের মধ্যে।

—তা আমি কি করতে পারি, বলুন।

—আপনি অনেক কিছু করতে পারেন। ইচ্ছা করিলেই আপনি আমাকে দু'একটা.....

—কি বলছেন আপনি? বাধা দিয়ে বললাম তাকে। কণ্ঠে একটু রুক্ষতাও দেখালাম। কারণ আমার ভয় হলো. হয় তো তিনি আমার গোপন কাজের সন্ধান পেয়েছেন।

—বলছি.....ইতস্ততঃ করতে লাগলেন তিনি।

—বলুন। আমি বাসায় যাবো। খাওয়া হয়নি এখনও। একটু তাড়া দিয়ে বললাম।

ভদ্রলোক অকস্মাৎ আমার হাত দুখানা ধরে বললেন,—জানেন ম্যাডাম, আমাদের ডেলী রিপোর্ট দাখিল করতে হয়। কিন্তু গত এক সপ্তাহ যাবৎ একটা ফল্‌স্ নিউজও দিতে পারছি না। সরকার আমার উপর তাই ভয়ানক রুষ্ট হয়েছে। কী করি বলুন?

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি আমার কাছে এসব কথা কেন বলছেন; কেনই বা আপনার গোপনীয়তা প্রকাশ করছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।

ভদ্রলোক কিছু একটা গোপন করছেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হলো। মনে হলো, নিজে ন্যাকা সেজে আমার নিকট থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করাই তার উদ্দেশ্য। শরীফ ভাইয়ের সাবধান বাণী স্মরণ হলো: "মনে রাখবেন, আপনার সামান্য ভুলের জন্য আমাদের মারাত্মক বিপদ আসতে পারে।" একটু সাবধান হয়ে গেলাম তাই। অপেক্ষাকৃত গম্ভীর হয়ে বললাম,—আমি সামরিক বিভাগের কর্মচারী। সরকারের প্রতি আমারও কর্তব্য রয়েছে, সে কর্তব্য যথারীতি প্রতিপালন করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করি। সামান্যতম অবহেলা করি না। এর বাইরে কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সে সময়ও নেই।

—কিন্তু অনেক আশা করে আপনার কাছে এসেছিলাম। অনুপ্রবেশ-কারীদের মধ্যে যাদের আহত অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় আপনি ইচ্ছা করলে তাদের নিকট থেকে অনেক গোপন পরিকল্পনার কথা অবগত হতে পারেন। তার দু'চারটা যদি আমাকে দেন তবে আমি তার উপর নির্ভর করে হেড কোয়ার্টারে রিপোর্ট পাঠাতে পারি।

বললাম, —আমি ডাক্তার। রোগের চিকিৎসা করাই আমার কাজ। কে অনুপ্রবেশকারী আর কে সত্যিকার মুক্তি সেনা তা যাচাই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে আমি চেষ্টা করে দেখবো আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারি কিনা।

—হাজার ধন্যবাদ।

অনেক কষ্টে ভদ্রলোককে বিদায় করলাম। পরে শুনলাম ডাক্তার দুলারাম তার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে নিজে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমার কাছে প্রেরণ করেছিলেন তাকে।

চিন্তা করে দেখলাম, ভদ্রলোককে হাতে রাখলে আমার দ্বিবিধ লাভ হবে। প্রথমতঃ আমাকে তিনি কিংবা তার সতীর্থরা সন্দেহ করবে না। দ্বিতীয়তঃ তার নিকট থেকে প্রয়োজনবোধে আমি গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হবো।

কিন্তু বাসায় গিয়ে আমার চাকর প্রতাপের নিকট থেকে পাওয়া একটা চিঠি পেয়ে আমার চক্ষু ছানাবড়া হলো। শুনলাম, সেই লোকটি আবার এসেছিল। আমাকে না পেয়ে একটা হাতচিঠি রেখে গেছে। চিঠিতে লিখেছে: আপনাকে ধন্যবাদ। মিলিটারী ইনফর্মারের ছদ্মবেশে যে লোকটা আপনার সাথে হাসপাতালে সাক্ষাৎ করেছিল সে আর কেউ নয় আমি স্বয়ং। আপনাদের দলেরই লোক। নেতার আদেশে যাচাই করতে গিয়েছিলাম সেখানে। আপনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রয়োজন মতো আবার সাক্ষাৎ হবে। বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। ডাক্তার দুলারামের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য আমাকে ঐ ছলনা করতে হয়েছিল। আগামী কাল ৯ তারিখে আমরা একই সময়ে শ্রীনগর, পুনচ ও ঘাউদ অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর সাথে যোকাবেলা করবো।

শ্রীনগর-জম্মু রোডের সংযোগ বিনষ্ট করবো আর বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ হস্তগত করার চেষ্টা চালাবো। আশা করি কৃতকার্য হবো। আপনি সাবধান থাকবেন।

আর একটা গোপন কথা আপনাকে বলে যাই, আপনার চাকর প্রতাপ আসলে ছদ্মবেশী। তাকে আমরাই আপনার খেদমতে নিয়োগ করেছি। তাকে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করবেন। কোনো ভয় নেই।

চিঠিখানা পড়া শেষ হলে বাথরুমে প্রবেশ করে প্রথমে সেখানা পুড়িয়ে ফেললাম। তারপর প্রতাপকে ডেকে বললাম,—তুমি আমার কাছে সত্যিকার পরিচয় গোপন করেছ কেন? তোমাকে আমি ক্ষমা করবো না।

হাসতে হাসতে সে বললো,—তা হলে আপনাকেও ক্ষমা করা হবে না। জীবনের মূল্য কারো কম নয়। আপনাকে পরীক্ষা না করা পর্যন্ত আমার জীবনের ঝুঁকি নেওয়া কি উচিত ছিল?

আশ্বস্ত হলাম প্রতাপের কথা শুনে।

পরদিন সত্যই শ্রীনগর, পুনচ আর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে মুক্তি সেনারা সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলো ভারতীয় বাহিনীর সাথে। আকস্মিক আক্রমণে বিস্তর ক্ষতিসাধন করতে সক্ষম হলো তারা। শ্রীনগর-জম্মু রোডের সংযোগ ছিন্ন করতেও তারা সক্ষম হলো। সারা কাশ্মীরে আগুন জ্বলে উঠলো। ভারতীয় বাহিনী হাজার চেষ্টা করেও 'সদা-এ-কাশ্মীর' রেডিও সেণ্টার আবিষ্কার করতে পারলো না। মুক্তি সেনাদেরও শায়েস্তা করতে অপারগ হলো। বাস্তব ক্ষেত্রে কাশ্মীর উপত্যকার আইন শৃংখল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হলো। মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। কখন কোন অঞ্চলে মুক্তি সেনারা হামলা চালিয়ে খাদ্যদ্রব্য ও অস্ত্রশস্ত্র করায়ত্ত করবে তার কোনো স্থিরতা ছিল না। সরকারী কর্মচারী ও সামরিক বিভাগের পদস্থ অফিসারদের মধ্যে এই সময় আমি হতাশার ভাব লক্ষ্য করলাম। সবাই যেন কেমন মনমরা হয়ে গেল।

রাত্রে প্রতাপ খবর নিয়ে এলো যে, মাসুদকে একেবারে বর্ডারে প্রেরণ করা হয়েছে। সুযোগ মতো যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রম করে পাকিস্তানী অধিকৃত কাশ্মীরের অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করার আদেশ প্রদান করা হয়েছে তাদের। ভারত সরকার অনুমান করেছেন, পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হলে কাশ্মীরের অভ্যন্তরে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে না।

আমাদের মুক্তিসেনারাও এমন একটা অনুমান আগেই করেছিল, এবং সে কারণেই তারা শ্রীনগর-জম্মু সড়কের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল। সীমান্ত এলাকার সামরিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করেছিল আর করতে চেয়েছিল সামরিক রসদ বিনষ্ট।

মাসুদের বর্ডার গমনের সংবাদ শুনে মনটা আমার ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। বহুদিন তার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। ক্যাম্পে থাকলে যে কোনো অজুহাতে হয় তো সে আমার কাছে আসতে পারতো। হয় তো দু'এক রাত থেকেও যেতে পারতো। কিন্তু একেবারে সীমান্ত ঘাটিতে তাকে প্রেরণ করার অর্থ হলো, আমার সাথে অলক্ষ্যে তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

যুদ্ধ মানেই ক্ষয়ক্ষতি—খুন খারাবি। সে নতুন অফিসার। প্রত্যক্ষ জ্ঞান তার সামান্যতমও নেই। সামান্য কারণে ভয়ঙ্কর বিপদে জড়িয়ে পড়াও তাই স্বাভাবিক।

মনটা আমার ভয়ানক চঞ্চল হয়ে উঠলো। সারারাত ঘুমাতে পারলাম না।

সকালে ঘুম ভাংলো সদা-এ-কাশ্মীরের নতুন খবরে। মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠলো। রেডিও সংবাদে জানা গেল যে, আমাদের মুক্তি সেনারা বারামুলার কাছে একটা ভারতীয় বেটালিয়নকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। চল্লিশ জন সৈন্য অকুস্থলে প্রাণ হারিয়েছে। ত্রিশজনের মতো মারাত্মক জখম হয়েছে আর হস্তগত হয়েছে সমস্ত গোলাবারুদ। তাছাড়া নওশেরা সেকটরের ছয়টি প্রধান

পুল তারা ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। শ্রীনগরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আকাশ বাণী দিল্লী থেকেও সে সংবাদের সত্যতা স্বীকার করা হলো। তারা আরও নতুন খবর পরিবেশন করলো। দিল্লী রেডিও থেকে বলা হলো,—সারা কাশ্মীরে ব্যাপক সংঘর্ষ চলছে দু দলের মধ্যে। চাটার বাল, বাটমলু এবং বাটওয়ারা অঞ্চলের সংঘর্ষ আরও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

শ্রীনগর ছাড়াও বারামুলা, সোপুর পাটান এবং চাম্ব এলাকায় উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। পুনচ এবং রাজৌরী সেক্টরে ভারতীয় ঘাটির উপরও হামলা চালিয়ে বিস্তর ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে মুক্তি সেনারা। তবে এক শতের মতো রাজনৈতিক কর্ম্মীকে বন্দী করা হয়েছে সংগ্রামরত মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্য করার অপরাধে।

মিসেস ইন্দিরা গান্ধী এবং মন্ত্রী গুলজারি লাল নন্দ সংগ্রামের ব্যাপকতা স্বীকার করে বিবৃতি দান করলেন। গুলজারিলাল নন্দ বললেন, 'অবস্থা আয়ত্বে নিয়ে আসার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে আমাদের আরও কঠোর হতে হবে। আরও নিষ্ঠুরতার পরিচয় প্রদান করতে হবে।'

মুখ্য মন্ত্রী জি. এম. সাদিক বলেন: পরিস্থিতি সত্যিই ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। এ'কে কি ক'রে আয়ত্বে আনতে হয় তা আমাদের জানা আছে। আমরা তা করবো। অচিরেই করবো।

ছুটাছুটি আরম্ভ হলো সর্বত্র। হাসপাতালে নাইট ডিউটি ছিল। সত্যিকথা বলিতে কি মুক্তি সেনাদের স্পাই হওয়া সত্তেও ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিলাম সারারাত। অবশ্য ইচ্ছা করলে রাত দুটোয় বাসায় ফিরতে পারতাম কিন্তু সাহস হয়নি। হাসপাতালেই রয়ে গিয়াছিলাম। সর্বত্র একটা আতঙ্কভাব বিরাজ করছিল।

ধরপাকড় আরম্ভ হলো ব্যাপক আকারে। কারো প্রতি সামান্যতম সন্দেহ হলেই তাকে বন্দী করতে লাগলো সামরিক বাহিনীর লোকেরা

পাকিস্তানী স্পাই কিংবা অনুপ্রবেশকারীর নামে অত্যাচার করা হলো অগণিত যুবকের উপর। একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হলো যেন সর্বত্র।

সাধারণ মানুষও তাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো। সারারাত হাসপাতালে অবস্থান করলাম সত্যি কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না, মনের দিক থেকে কিছুতেই স্বাভাবিক হতে পারলাম না। কেমন যেন একটা উত্তেজনা, একটা শংকা সারাদেহ-মন আচ্ছন্ন করে রাখলো। খেলায় খেলায় যে মারাত্মক পরিবেশে কাশ্মীরের যুব সম্প্রদায় প্রবিষ্ট হয়েছে তার এক ভয়ঙ্কর ক্রান্তি লগ্নে এসে হাজির হয়েছে তারা আজ। জানি না, এর শেষ কোথায়; পরিণতিই বা কী?

॥ নয় ॥

অত্যাচারের মাত্রা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, নিপীড়িত মানুষের ধৈর্যের বাঁধ যখন ভেঙ্গে যায় তখন তারা যে কতো দুর্বিনীতভাবে প্রতি আক্রমণ করতে পারে তা যারা ফ্রান্সের বিপ্লব ও চীন-রাশিয়ার গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাস পড়েনি তারা কাশ্মীর উপত্যকার সংগ্রামীদের দুর্বার আন্দোলনের পরিস্থিতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না।

সকালে রেডিও খুলেই যে সংবাদ ও প্রচার কর্ণগোচর হলো তা যে-কোনো মানুষের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি মুক্তিসংগ্রামীদের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ভয়ানক ভীত হয়ে পড়লাম। মনে হলো, যে-কোনো মুহূর্তে আমাদের অঞ্চলেও সংগ্রামের ব্যাপকতা ছড়িয়ে পড়তে পারে। তবু একটু ভরসা হচ্ছিল এই ভেবে যে, মুক্তি সংগ্রামীরা কোথাও সাধারণ নাগরিক অথবা সরকারী কর্মচারীর উপর সামান্যতম অত্যাচার করছে না। তাদের আক্রমণ সামরিক বাহিনীর উপর সীমাবদ্ধ রয়েছে।

সদা-এ-কাশ্মীরে বলা হলো : ১২ই আগষ্ট মুক্তি সেনারা একই সময় পাঁচটা শহরে সামরিক বাহিনীর জোয়ানদের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে। শহরের অধিবাসীরাও মুক্তি সেনাদের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছে। তারা শ্রীনগর-লেহ রোডের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। সামরিক বাহিনী কিছুই করতে পারেনি তাদের। পক্ষান্তরে বিভিন্ন স্থানে পঞ্চাশ জনের মতো ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়েছে।

ওদিকে শ্রীনগর এয়ার পোর্টের পেট্রোল পাম্প উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অপর দিকে আর একদল মুক্তি সেনা আঁখাউরের নিকটবর্তী মিলিটারী ক্যাম্পটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার আশে পাশেও।'

সদা-এ-কাশ্মীরের অবস্থিতি সম্বন্ধে আমারও কোনো সঠিক ধারণা ছিল না। মনে হচ্ছিল, আমাদের শহর থেকে খুব দূরে নয় সে স্টেশন। প্রতাপকে তাই জিজ্ঞেস করলাম,—প্রতাপ, তুমি বলতে পারো কোথায় অবস্থিত আমাদের নিজস্ব রেডিও সেন্টার সদা-এ-কাশ্মীর ?

সে প্রশ্ন শুনে ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো, তারপর বললো,—দিদি এখনও আমরা পুরোপুরী স্বাধীন হতে পারিনি। পারিনি নিরাপদ হতে। তাই এখনই আমাদের রেডিও সেন্টারের হদিস প্রচারিত হওয়া উচিত নয়।

—আমাকে তুমি সন্দেহ করো নাকি ?

—সন্দেহ করা দোষের নয়। এটা এতো মারাত্মক জিনিস যে, ব্যাপক-ভাবে দলের প্রত্যেক সদস্যকে এ গুপ্ত সেণ্টারের হদিস জানানো উচিত নয়। রেডিও হলো সব চাইতে কার্যকর অস্ত্র। প্রত্যেক দেশের সরকার তাই বিপ্লবের সময় তার বেতার কেন্দ্রকে সংরক্ষণ করতে চেষ্টা করে। আবার বিপ্লবীরা প্রথম প্রচেষ্টায় সেটাই দখল করার প্রচেষ্টা চালায়। তাই দেখা যায়, বিপ্লবের সময় প্রচার যন্ত্র যাদের হাতে থাকে

ইচ্ছামাফিক প্রচারের বদৌলতে তারাই দেশের কর্তৃত্ব সংরক্ষিত রেখেছে বলে দাবী জানতে পারে।

— তা পারে, কিন্তু আমাদের বেতার কেন্দ্রটির অবস্থিতির স্থান আমরা জানতে পারবো না কেন?

—কারণ হলো, এটা একটা নতুন স্টেশন। সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাকে আবিষ্কার করে ধ্বংস করার জন্য। দেশব্যাপী এখন চলছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংগ্রাম-বিদ্রোহ। এখন একজন মুক্তি সেনা কোনো প্রকারের বন্দী হয়ে যদি শারীরিক অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সে গোপন আস্তানার কথা প্রকাশ করে তবে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাই কারো কাছে বলা হয়নি। রেডিও সেণ্টারে যথেষ্ট পরিমাণে গার্ড নিয়োগ করাও হয়নি। অনুসন্ধানীদের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য।

—তুমি জানো, সেণ্টারটি কোথায়? প্রশ্ন করলাম আমি।

—না দিদি। আমাকেও বলা হয়নি। আমি জানতেও চাইনি। আমাদের মূলনীতি লঙ্ঘন করতে চাই না আমরা।

— যাক্, দরকার নেই তার। বললাম আমি।

— ঘুমিয়ে পড়ুন এখন। সকালে নতুন সংবাদ শোনা যাবে আবার। আদেশ করলো আমার ছদ্মবেশী চাকর প্রতাপ।

প্রতাপের আসল নাম আমি জানার চেষ্টা করিনি। করা উচিতও ছিল না। দেয়ালেরও কান আছে। আমার প্রতিবেশীরা সবাই হিন্দু, গোড়া হিন্দু। কোনো সময় যদি ভুল করে আমি তার মুসলমানী নাম ধরে ডাকতাম কিংবা প্রকাশ করে ফেলতাম তবে একদিকে আমাদের ধরা পড়া যেমন সহজতর হতো, অন্যদিকে তেমনি কঠিন হতো সে পাড়ায় বাস করা। প্রতাপ নামেই ডাকতাম তাই আমি তাকে। সেও আমাকে আপা না বলে দিদি বলে সম্বোধন করতো।

সকালে ঘুম থেকে উঠতেই সেই তাজা তাজা খবর। সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায় সেই ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ, রাহাজানি আর প্রাণহানীর খবর। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ।

সদা-এ-কাশ্মীরের সংবাদই তখন মানুষ শুনতে আরম্ভ করলো। কারণ সেখান থেকে দেশের আভ্যন্তরীণ সঠিক সংবাদ প্রচারিত হতে লাগলো। দিল্লীর রেডিও প্রথম দিকে সে সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করলেও সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটার মধ্যে সব কিছু স্বীকার করে নিতো।

১৩ তারিখে সমগ্র কাশ্মীরে বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের শহরেও কয়েক স্থানে আগুন জলতে দেখা গেল। শুনা গেল জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাণ ভয়ে অধীনস্থ কর্মচারীদের সাবধানে কথা-বার্তা বলা ও জীবনের ঝুঁকি না নেওয়ার আদেশ জারি করেছেন। মুসলমান অধিবাসীদের 'সীজ' করা বন্দুক রাইফেল ফেরৎ দিতে সম্মত হয়েছেন।

সংবাদে শোনা গেল: শ্রীনগর শহরের বক্ষস্থলেই মুক্তি সংগ্রামীদের সাথে ভারতীয় বাহিনীর সুদীর্ঘ ছয় ঘণ্টা ধরে একটানা যুদ্ধ চলেছে তবুও মুক্তি সেনাদের দমন করা সম্ভব হয়নি।

অপর পক্ষে সাম্বারো নিকটে একটা ভারতীয় কনভয় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে গোপন আক্রমণকারীর আকস্মিক আঘাতে। তাছাড়া কয়েকটি পেট্রোল পাম্প ভস্মিভূত হয়েছে আর হয়েছে 'উরী'তে অবস্থিত ভারতীয় সামরিক ক্যাম্পটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। মাউন্দি থেকে অসামরিক ব্যক্তিদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করতে বাধ্য হয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ।

প্রতাপ নিম্ন কণ্ঠে বললো, —শহরের প্রান্তে যেখানে মিলিটারী ক্যাম্প ছিল না? সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী সীমান্তে অপসারিত হলেও তাদের এ্যামুনিশন ডাম্পটি এখনও ওখানে রয়ে গেছে। মাত্র কয়েকজন রক্ষীকে রেখে গেছে তারা।

—কেন? এ্যামুনিশন ডাম্প স্থানান্তরিত করেনি কেন?

—গোলাবারুদ একেবারে বর্ডারে নেওয়া হয়তো নিরাপদ নয়। হয় তো সেখানে ড্যাম্প তৈরী সমাপ্ত হয়নি এখনও।

—বেশ, তা আমাদের কর্তব্য কি? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—আমাদের কর্তব্য হলো সুযোগ মতো সেখানে ডিনামাইট বসিয়ে ওটাকে ধ্বংস করে দেওয়া।

—চলো না এক রাত্রে যাই। সমাধা করে আসি। সবাই কিছু না কিছু কাজ করছে আর আমরা নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকবো? দায়িত্ব যখন একটা দিয়েছে তখন সেটা অন্ততঃ সমাধা করি। জীবনের মায়া আর আমার নেই।

—কেন, মাসুদ ভাইকে নিয়ে স্বাধীন দেশে ঘর বাঁধবেন না? সংসার করবেন না?

—তুমি তাও জানো নাকি? সাধ তো অনেক কিছু আছে। পূরণও করতে চাই, কিন্তু সেজন্য কি কাজ করতে হবে না?

—নিশ্চয় হবে, তবে এখনই নয়। ইঙ্গিত আসবে।

—কবে আসবে? এখনই কেন আসছে না?

আমার প্রশ্নের জবাবে প্রতাপ যা বললো তা বেশ যুক্তিসংগত মনে হলো। তার ব্যাখ্যানুযায়ী পাকিস্তানের পক্ষ থেকে অধিকৃত কাশ্মীর আক্রমণের প্রভূত সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া যাচ্ছে না। তারা যখন আক্রমণের পরিকল্পনা পাকাপাকি করবে তার কয়েক দিন পূর্বে মাত্র ওটা ধ্বংস করা হবে। বেশী আগে করলে ভারতীয় বাহিনী আবার গোলাবারুদ আর সাজ সরঞ্জাম আমদানী করার সুযোগ পাবে। পাকিস্তানকে তা হলে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে সেটা ধ্বংস করা যায় তবে ভারতীয় বাহিনী পঙ্গু হয়ে পড়বে। পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না।

উত্তেজনায় সারা রাত ঘুম হলো না। ভোরেই প্রতাপকে বললাম,—আমার একটা চিঠি তুমি মুক্তি সংগ্রামের কর্মীর মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সংস্থার কাছে পৌঁছে দিতে পারো?

—নিশ্চয় পারি। নিকটেই তো আমাদের গোপন অফিস রয়েছে। কিন্তু কি এমন জরুরী খবর রাতের মধ্যে সংগ্রহ করলেন দিদি, যা এখনই পৌঁছে দেওয়া দরকার?

—কনফিডেনশিয়াল। এখন জানতে চেওনা প্রয়োজন হলে আমি নিজেই বলবো।

—আচ্ছা।

কথা বাড়ালো না সে।

অনেকদিন পরে শরীফ ভাইয়ের কোড ল্যাংগুয়েজ ব্যবহার করলাম। একটা চিঠি লিখলাম হেড অফিসে। অনুমতি চাইলাম এ্যামুনিশন ডাম্পএ আগুন ধরিয়ে দেওয়ার।

দুদিন পরেই জবাব চলে এলো। তারা জানালো,—'হাঁ, ১৬ই রাত্রে কাজে হাত দিতে পারেন, তবে সাবধান, অকৃতকার্য হলে কিংবা ধরা পড়লে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশী। সামরিক বাহিনী কিন্তু আমাদের ডোদা অঞ্চলের আড্ডার সন্ধান পায়নি।

আপনাকে যদি তারা কোনো প্রকারে সন্দেহ করতে পারে তবে সহজে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না।

মনে রাখবেন, ডাম্প পুড়িয়ে দেওয়ার চাইতে আপনার বেঁচে থাকারই প্রয়োজন বেশী। অতীতে আপনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বারবার যে সমস্ত কাজ করেছেন তার রেকর্ড আমাদের কাছে রয়েছে। পূর্ণক্ষমতা আমাদের হাতে এলে আমরা আপনাকে পুরস্কৃত করবো। মাসুদ সাহেবও আপনার সাথে পুনর্মিলনের জন্য অস্থির হয়ে পড়েছে। সে রয়েছে এখন একেবারে বর্ডারে। তাই আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে কিংবা আপনাকে পত্র লিখতে ভয় পাচ্ছে। সুযোগ পেলেই চলে আসবে আপনার কাছে। তার কারণেই আপনাকে বেঁচে থাকতে হবে। সে আপনাকে ছাড়া এ দুনিয়ার কারো চিন্তা করতে পারে না। আপনাদের উভয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই আমরা আপনাদের উপর নতুন কোনো দায়িত্ব দিচ্ছি না। কিছু করার জন্য আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন

বলেই এ দায়িত্বটা দেওয়া হলো। আশাকরি সাবধানে কার্য হাসিল করবেন।'

আমার প্রতি মাস্থদের প্রেম, মুক্তি সংগ্রামীদের সদিচ্ছা ও আবেদনের মঞ্জুরী একত্রে পেয়ে মনটা খুব ভালো লাগলো। বেশ খানিকটা স্বাভাবিক হতে পারলাম। প্রতাপকে কিছু বললাম না তবু।

বিকেলে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এ্যামুনিশন ডাম্প-এর দিকে গেলাম। ঘুরতে ঘুরতে একেবারে ডাম্পের কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, বেশ অনেকখানি স্থান নিয়ে তৈরী সে ডাম্প। বেশ সুরক্ষিত। অদূরে একটা গৃহও দৃষ্টিগোচর হলো। সন্ধান নিয়ে জানলাম, ওতেই অবস্থান করে ডাম্পের প্রহরীরা। চতুর্দিকে উঁচু পাঁচিলের উপরে কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা সে ডাম্প। বা'র থেকে একটা গেট ছাড়া প্রবেশ করার অন্য কোনো উপায় নেই। পিছনের দিকে যে গেটটা রয়েছে সেটা ভিতর থেকেই বন্ধ।

শুনলাম, দুজন ক'রে প্রহরী থাকে পালাক্রমে। চার ঘন্টা পরে নতুন দুজনের আগমন হয় ঐ ঘর থেকে। তাদের শেষ হলে আবার দুজন। এইভাবে চলে চব্বিশ ঘন্টার ডিউটি।

দূর থেকে ঘুরে ঘুরে দেখে শুনে তো এলাম কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে প্রবেশ করবো কি করে সেখানে? কার্য হাসিল করবও বা কেমন করে?

সন্ধ্যার পর চলে এলাম বাসায়। প্রতাপের সাথে আলাপ করবো মনে করলাম। ১৬ তারিখের তখনও দুদিন বাকী। বিস্তর সময় হাতে। ব্যস্ত হবার তাই কিছু নেই। বললাম মনকে।

আমাকে দেখেই প্রতাপ লাফিয়ে উঠলো। বললো,—এতো দেরী করে ফেরে? সেই কখন থেকে আমি পথ পানে চেয়ে রয়েছি।

—কেন, কোনো জরুরী খবর আছে নাকি?

—আছে নাকি মানে? আলবৎ আছে। ভারি খুশীর খবর। সেই ভদ্রলোক আবার এসেছিলেন। তিনি বলে গেলেন, আগামী ১৫ই

আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে একই সময়ে আমাদের লোকেরা নতুন করে শ্রীনগর, পুনচ্, নওশেরা, উরী, বারামুলা এবং জম্মুতে আক্রমণ চালাবে। তাদের স্বাধীনতা দিবসেই আমাদের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন হবে।

—তাই নাকি? তা হলে তো ১৬ই তারিখে আমাকে আর দুঃসাহসিক অভিযানে বের হতে হবে না।

—কোথায় যাবেন আপনি? আপনি আবার কী অভিযান করবেন? হাসতে হাসতে বললো সে।

—দেখে নিও কি করি।

কথা বাড়ালাম না। এ্যামুনিশন ডাম্প-এ আগুন জ্বালাবার পরিকল্পনা করতে লাগলাম মনে মনে। কোনো কূল কিনারা করতে পারলাম না সারা রাতের মধ্যে। বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত হলো আমার।

সকালে খাবার টেবিলে প্রতাপ বললো,—চিঠিটায় কী লেখা ছিল আমাকে বললেন না তো? নিশ্চয় কোনো কাজের আদেশ আছে।

এ্যামুনিশন ডাম্পের কথা বললাম প্রতাপকে। সে বললো,—এ নিয়েই আপনি চিন্তা করছেন? ওটা তো আমার একার পক্ষেই যথেষ্ট। আপনি যদি একটা লোহার রড আর এক শিশি মরফিয়া আমাকে দিতে পারেন তবে আমি একাই ওটা উড়িয়ে দিতে সক্ষম হবো।

একটু পরেই সংবাদ পত্র দিয়ে গেল হকার। বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছে। সেদিন সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। আমাদের পাড়ায় ঘরে ঘরে আনন্দোৎসবের আয়োজন চলছে। প্রতাপও কয়েকটি রঙিন কাগজ ও বেলুন কিনে এনেছে দোকান থেকে। বারান্দাটা সাজিয়ে তুলেছে তা দিয়ে।

পাকিস্তানে আযাদী দিবস পালিত হয়েছে একদিন আগে ১৪ই আগস্ট। সে দেশের নেতাদের বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিও প্রকাশিত

হয়েছে ভারতীয় পত্রিকায়। দেখলাম, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ আইয়ুব খান বলেছেন: এখনও সময় আছে। এখনও যদি ভারত সরকার কাশ্মীর সমস্যার সম্মানজনক সমাধানের জন্য এগিয়ে আসেন তবে আমরাও সানন্দে এগিয়ে যাবো। যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে প্রবেশ করার মতো আর্থিক অবস্থা আমাদের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের নেই। আমরা যুদ্ধ চাই না। শান্তি চাই।

এদিকে কাশ্মীরের মুখ্য মন্ত্রী জি, এম, সাদিক তার বাণীতে বলেছেন,—কাশ্মীরের অভ্যন্তরে যদি আরও কিছু দিন যাবৎ বিদ্রোহ. বিপ্লব আর বিশৃঙ্খলা চলে, অনুপ্রবেশকারীরা আত্মসমর্পণ না করে তবে আমরা পাকিস্তানের সাথে সকল সংশ্রব পরিত্যাগ করবো।

সন্ধ্যার সংবাদে শুনলাম,—কচ্চো সংঘর্ষের বন্দী বিনিময় হয়েছে দু'সরকারের মধ্যে। ওয়াগাহ সেক্টর দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে সে বিনিময়। পাকিস্তান সরকার তার একজন অফিসার ও চারজন জোয়ানের বিনিময়ে ভারতকে ফেরৎ দিয়েছে একজন জে, সি, ও (JCO), তিনজন অফিসার আর পঁয়ত্রিশ জন জোয়ানকে।

মনে হলো দু'দেশের নেতারা বোধ হয় তাদের সম্পর্কের উন্নতি করার চেষ্টা করছেন। ভারতের সাথে যুদ্ধ করার ঝুঁকি নিতে পাক সরকার সাহসী হচ্ছেন না।

কিন্তু রাত্রের সংবাদে মনটা আবার চাঙ্গা হলো। দেখা গেল মুক্তি সংগ্রামীদের পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী তারা সারা শ্রীনগর শহর তছনছ করে দিয়েছে। সরকারী অফিস আদালতে আগুণ ধরিয়ে দিয়েছে। আনন্দ মুখর নগরী মুহূর্তে বিষাদে পরিণত হয়েছে।

অন্যান্য অঞ্চলেও সেই একই অবস্থা।

হাসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় একশিশি মরফিয়া গোপনে নিয়ে এসেছিলাম। প্রতাপ একটা লোহার রড কোথা থেকে সংগ্রহ করে রেখেছিল আগেই।

রাত বারোটার পরে দুজনে কালো পোশাকে দেহ আবৃত করে বেরিয়ে পড়লাম মাঠের পথে এ্যামুনিশন ডাম্পের অভিমুখে। একটানা এক ঘন্টা চলার পর পিছন দিক থেকে হাজির হলাম সেখানে। একজন সেন্ট্রি তখন রাইফেল কাঁদে ধীর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল সদর গেটের দিকে। তড়িতে আমাদের কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

একটা রুমালে বেশ খানিকটা মরফিয়া ঢেলে নিলাম। প্রতাপ এগিয়ে গেল অতি সন্তর্পণে, অতিশয় সাবধানে। অকস্মাৎ মারলো এক বাড়ী প্রহরীর মাথায়। ক্ষণিকের জন্য চক্ষু মুদ্রিত করলাম আমি। সশব্দে পড়ে গেল লোকটি মাটিতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে লাগলো তার মাথার ক্ষতস্থান থেকে। মরফিয়া মিশ্রিত রুমালখানা এগিয়ে দিলাম প্রতাপের হাতে। দ্রুত নাকে বেঁধে দিলো সে রুমালখানা। জ্ঞান ফিরতে তার একঘন্টা সময় লাগার কথা।

রাইফেলটা কাঁধে নিলো প্রতাপ, দেহের পোশাক খুলে নিলো সে। আমি তখন বাড়তি কাপড় দিয়ে বেচারার ক্ষত স্থানটা বেঁধে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। স্পাইগিরির কঠোরতার চাইতে ডাক্তারী মনের কোমলতা আমার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করলো অধিক।

প্রতাপ ইতিমধ্যে অচৈতন্য গার্ডের পোশাকে নিজেকে সুসজ্জিত করে নিয়েছে নিখুঁতভাবে। তার হাত পাও সে বেঁধে ফেলেছে শক্ত করে। আমাকে সে বললো,—আপনি পশ্চিম দিক থেকে ঘুরে ঐ গাছটার নীচে গিয়ে দাঁড়ান। আমি ধীরে ধীরে প্রহরীর ছদ্মবেশে হাজির হই সদর গেটে। ওখানে যে সেন্ট্রিটা আছে তাকে কাবু করা কঠিন হবে না। আমি যখন সাদা রুমালটা উড়িয়ে দেবো তখন আপনি দ্রুত চলে আসবেন সেখানে। বুঝবেন পথ পরিষ্কার।

সময় নষ্ট না করে দ্রুত চলে গেলাম প্রতাপের নির্দেশিত স্থানে। ভয়ে, উত্তেজনায় আর সন্দেহে থর থর করে কাঁপতে লাগলো দেহটা। অন্ধ-

কারে গাছটির আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রতাপের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলাম।

প্রতাপ সেন্ট্রির পোশাকে সজ্জিত হয়ে রাইফেলটা কাঁধে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। গেটের কাছে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল একজন প্রহরী তার দিকে চলে যাচ্ছে। হৃদপিণ্ডের উত্থান পতন দ্রুততর হলো আমার। বুকের ভিতর হাতুড়ী পিটানর শব্দ শুনতে পেলাম।

লোকটা প্রতাপের কাছে যেতেই প্রতাপ হয় তো তার কাছে সিগারেট চাইল। পকেটে হাত দিলো লোকটি। আর যায় কোথায়? সেই অবসরে প্রতাপ দু'হাতে রাইফেল উঁচিয়ে শরীরের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে মারলো এক আঘাত। বাবাগো বলে লোকটা নিপতিত হলো মাটির উপরে। প্রতাপের রুমাল উড়ানো পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। অর্ধ ছুটন্ত অবস্থায় হাজির হলাম অকুস্থলে। ইশারায় প্রতাপ মরফিরা মিশ্রিত শিশি চাইল আমার কাছে।

মাথায় পট্টি বেঁধে দিলাম তার। হাত পা দুখানা ভালো করে বেঁধে দিলো প্রতাপ।

তার পর অভ্যন্তরে প্রবেশের কথা বললাম আমি। সে কিন্তু আমার সাথে এক মত হলো না। বললো,—প্রহরীদের ঐ ঘরটার বাইরে থেকে দরজা আটকে দিয়ে আসা দরকার। ওদের ঘুম ভেঙ্গে গেলে যদি বাইরে আসে আর আমাদের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পারে তবে হয় তো ধরা পড়ে যাবো আমরা। এ্যামুনিশন ডাম্প পুড়ানো আর হবে না। জীবনে মরতে হবে দু'জনেরই।

মৌন সম্মতি জানালাম তার প্রস্তাবে। দ্রুত এগিয়ে গেল সে সেন্ট্রিদের ছোট্ট ঘরটির দিকে।

অল্পক্ষণেই প্রতাপ প্রত্যাবর্তন করলো আবার। ইতিমধ্যে গেট ভেঙ্গে ফেলার পরিকল্পনা করে ফেলিছি আমি।

প্রতাপ ফিরে এসে বললো,—বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলাম। ইচ্ছা করলেও সাহেবরা আর বেরুতে পারবে না।

লোহার রডটি ছাড়া হাতিয়ার বলতে আমাদের কাছে কিছু ছিল না। দরজা ভাঙ্গা ছিল প্রায় অসম্ভব। অনেক কষ্টে প্রায় পনেরো মিনিট ধরে অস্বাভাবিক পরিশ্রমের পর প্রতাপ সবগুলি তালা ভাংতে সক্ষম হলো। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল আমার ধরা পড়ার। কখন কোন বিপদ মাথায় চাপে খোদা জানে।

খোদার মেহেরবানীতে কেউ এলো না, একটা পাখী পর্যন্ত টের পেল না। দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম আমরা। ভয়ানক অন্ধকার সর্বত্র। সাপ-পোকের ভয়ও ছিল। তবুও দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাবার উপায় ছিল না। কোথায় বারুদের ডিপো কে জানে। আগুনের টুকরো যদি একবার বারুদে পড়ে তবে আমাদের জীবনও সাঙ্গ হবে। বাধ্য হয়ে অন্ধকারেই অন্ধের মতো অনুমানের উপর নির্ভর করে পথ চলতে হচ্ছিল আমাদের। অনেকক্ষণ ধরে অনেকদূর যাবার পর প্রতাপ বললো,—এবার আলো না জ্বেলে উপায় নেই। বেশী সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।

বলার কিছু ছিল না আমার। সে সাবধানতার সাথে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালালো। দেখলাম, একেবারে পেট্রোলের ট্যাঙ্কের কাছে পৌঁছে গেছি আমরা।

—বারুদের ডিপো নিশ্চয় এদিকে নয়। বললো প্রতাপ।

—কি জানি কোথায়? বললাম আমি।

পকেট থেকে কাগজ বের করে তার মধ্যে চাপা দিয়েই আগুন নেবালো প্রতাপ। এগিয়ে চললাম আরও উত্তরের দিকে। কিছু দূর যাবার পরে আবার কাঠি জ্বালালো প্রতাপ। এবার দেখলাম, বারুদের প্যাকেট। প্রতাপ তখন বললো,—আর সময় নষ্ট করা ঠিক নয়। ডিনামাইট ষ্টিক বের করুন তাড়াতাড়ি! কয়েলও।

ডিনামাইট দিলাম তার কাছে। ঝটপট ডিনামাইট ষ্টিক দুটো বারুদের বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তার সাথে যোগ করলো কয়েল। তারপর ফিউজ তারের কয়েলটা লম্বা করে একেবারে শেষ দরজারটার কাছে এনে কোনো প্রকারে পাঁচিলের উপর দিয়ে ফেলে দিলো বাইরে।

আর বিলম্ব নয়। ঊর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগলাম দুজনে সদর দরজার দিকে। দরজা বন্ধ না করেই বেরিয়েই এলাম তাড়াতাড়ি। কোনো দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে ছুটলাম পিছনের দরজার কাছে প্রথমে যে প্রহরীটাকে আঘাত করে মরফিয়ার সাহায্যে সংজ্ঞাহীন করে রেখেছিলাম, দেখলাম তার জ্ঞান ফিরেছে। দাঁত দিয়ে সে বাঁধন খোলার চেষ্টা করছে। আমরা কাছে যেতেই সে মিলিটারী মেজাজে জিজ্ঞেস করলো,—কে ওখানে ?

প্রতাপ চাপা গলায় জবাব দিলো,—তোমার বাবা। বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। বাঁধন খুলতে পারবে না।

—চুপ র‍ও শোয়ারের বাচ্চা। দাঁত খিচিয়ে বললো আহত সেন্ট্রিটি আবার।

তার মুখ ভ্যাংচানি শুনে প্রতাপের রাগ হলো। সে রডটা বাগিয়ে নিয়ে তারদিকে এগিয়ে গেলো। বাধা দিলাম তাকে আমি।

চাপা কণ্ঠে বললাম,—দরকার নেই। ওকে মেরে লাভ কি ? আসল কাজের তো এখন কিছু হলো না।

প্রতাপ আমার নিষেধ শুনলো। দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেল কয়েলের দিকে। আমিও অনুসরণ করলাম তাকে। কয়েক সেকেণ্ড পরেই পাঁচিলের উপর দিয়ে ঝুলন্ত কয়েল দেখতে পেলাম আমরা। প্রতাপ কয়েলের কাছে দাঁড়িয়ে আদেশ করলো আমাকে,—চলে যান দিদি। যতোদূর পারেন পথ এগিয়ে নিন। আগুন জ্বালিয়ে দিয়েই আমি ছুটে আসছি। আপনি মেয়ে মানুষ। আমার সঙ্গে ছুটে পারবেন না। বারুদে আগুন লাগলে বাঁচাও মুশকিল হবে।

প্রতাপকে রেখে পালাতে মন না চাইলেও পারলাম না তার অবাধ্য হতে। এসময় মনে হলো, সেই যেন আমার মনিব। আমি তার আজ্ঞাবাহী দাস।

পাঁচ শ' গজ হয় তো গিয়েছি, এমন সময় দেখি প্রতাপ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে আমার পিছনে। প্রাণপণে ছুটলাম আরও কিছুদূর; হয় তো আরও দু'শ গজ।

হঠাৎ প্রচণ্ড আওয়াজে আমাদের পায়ের তলার মাটি কেঁপে উঠলো। বুঝলাম, ডিনামাইটে আগুন পৌঁছে গেছে। আমরা তবু ছুটছি প্রাণপণে। তারপর আর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ শুনতে পেলাম। গভীর রাতের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিকবিদিক ছড়িয়ে পড়লো সে প্রচণ্ড শব্দ। ভাবলাম, শহরের লোকের যদি ঘুম ভেংগে যায় তা হলে বাসায় ফিরবো কেমন করে আমরা?

চিন্তার সময় নেই তখন, প্রাণ হাতে নিয়ে ছুটছি। ঘুমঘোরে স্বপ্নের মতো ছুটছি। কিন্তু ছুটবো কি? একটার পর একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ আমাদের কর্ণ বিদীর্ণ করে দিতে লাগলো।

শহরের পথে প্রবেশ করেছি তখন আমরা। একবার পিছন ফিরে তাকাতেই আমার শরীর কেঁপে উঠলো। মনে হলো, এ কি সর্বনাশ করে এলাম?

বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্যে তখন যেন বাজী পোড়ানোর উৎসব চলছে। শুধু পট পট আওয়াজ আর আগুনের লেলিহান শিখা। দাউ দাউ করে জ্বলতে লাগলো মিলিটারীদের এ্যামুনিশন ডাম্পটা। মানুষ জেগে থাকলে পাঁচ মাইল দূর থেকে দেখতে পেতো সে ভয়ঙ্কর আগুনের লেলিহান শিখা।

নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলাম, জীবনে যা কল্পনা করতে পারতাম না তাও নেশাখোরের মতো অবচেতন মনে করে এলাম, স্পাই জীবনের সব চাইতে মারাত্মক কাজ কৃতকার্যতার সাথে সমাপ্ত করে এলাম – সুখনিদ্রা হবার কথা ছিল আমার। কিন্তু কিছুতেই দুচোখের পাতা একত্র করতে পারলাম না।

বার বার দেহটা যেন কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। মনে হতে লাগলো,—করলাম কি আমি এ? এমন দুঃসাহসিক কাজ আমি

কেমন করে করলাম? হাজার হাজার টাকার অতি প্রয়োজনীয় সামরিক রসদ তো নষ্ট করলামই কয়েকটা জ্যান্ত মানুষকেও পুড়িয়ে মারলাম! আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে কি? পরকালে আমি কি পরিত্রাণ পাবো?

।। দশ ।।

সকালে যথারীতি হাসপাতালে গেলাম। কিন্তু মনটা আমার এক অজানা কারণে শঙ্কিত হয়ে রইল। বারবার মনে হতে লাগলো,—এখনি বোধ হয় মিলিটারীরা এসে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। ফাঁসী দেবে। কেমন যেন মনম হয়ে গেলাম তাই। কাজে ভুল হতে লাগলো বারবার। আমার অবস্থা দেখে ডাক্তার দুলারাম বললেন, —আপনি বাসায় চলে যান। বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

কিন্তু আমার মনে হলো, বাসায় একাকী থাকলে আতঙ্ক আর দুশ্চিন্তা আরও বাড়বে, মাথা খারাপ হয়ে যাবে। হাসপাতালে কাজের মধ্যে ডুবে থাকলে হয়তো ভুলে থাকতে পারবো সব অন্তর্জ্বালা। দূর হবে মানসিক অশান্তি। তাই ডাক্তার দুলারামকে বললাম,—ও কিছু না। সামান্য দুর্বলতা। এক্ষনি ঠিক হয়ে যাবে। ছুটির প্রয়োজন হবে না।

সারা শহর শুধু নয়, সারা কাশ্মীর উপত্যকা অবাক হয়ে গেল এ্যমুনিশন ডাম্প উড়িয়ে দেওয়ার সংবাদ শুনে। সামরিক বিভাগের কর্মচারীরা হতভম্ভ হয়ে গেল এতোবড় একটা অভূতপূর্ব ক্ষতি দেখে। তারা চিন্তাও করতে পারেনি এটা।

কিন্তু এই ঘটনার পর থেকে ডোদা শহরে আরম্ভ হলো সন্ত্রাসের রাজত্ব। ডোগরা পুলিশ আর ভারতীয় মিলিটারী অতিশয় তৎপর হয়ে উঠলো সেখানে। তারা ঘরে ঘরে খানাতল্লাসী করতে লাগলো। মোড়ে মোড়ে মানুষ ধরে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে আরম্ভ করলো। সন্তোষ-

জনক জবাব না পাওয়া পর্যন্ত কাউকে রেহাই দিলো না। শুনলাম, অযথা সন্দেহ করে ভারতীয় ভ্যামপায়ারের দল কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকে বন্দী করে নিয়ে গেছে। তাদের উপর অমানুষিক শারীরিক অত্যাচার করেছে কিন্তু কিছু স্বীকার করাতে পারেনি।

হাসপাতালে ডিউটীতে যেতে আমার দস্তর মতো ভয় লাগতো। প্রতাপ কিন্তু নির্ভয়ে বাজারে পার্কে এমনকি যেখানে মিলিটারী বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করে সেখানেই যেতো। এতটুকু ভয় ছিল না তার হৃদয়ে।

ভয়ে ভয়ে অতিবাহিত হলো আর একটা দিন। নতুন কোনো খবর সংগ্রহেরজন্য আর মাথা ঘামালাম না। গোপনে সদা-এ-কাশ্মীরের খবরটা শুধু শুনলাম। দেশের মারাত্মক অবস্থা সম্বন্ধে কারো সাথে আলোচনা করা যুক্তিসংগত মনে করলাম না।

রাত বারোটার সময় যে সংবাদ পেলাম তাতে মনে হলো জয় আমাদের সুনিশ্চিত। আমাদের লোকেরা পুনচ এলাকায় চারটে ভারতীয় পোষ্টে আঘাত হেনেছে। শ্রীনগর শহরের উত্তর পশ্চিম দিকের বিভিন্ন ঘাটিতে মুজাহীদ বাহিনী ভারতীয় ট্রুপের উপর মারাত্মক আঘাত হেনে বিস্তর ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

বারামুলার ব্রিগ্রেড হেড কোয়ার্টার-এ আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে ৩৩ জন সৈনিক, একজন কর্নেল, একজন লেফটেন্যান্ট কর্নেল এবং ১ জন ক্যাপ্টেনকে হত্যা করছে মুক্তি সেনারা। এ সংবাদে আমাদের অঞ্চলে শোকের ছায়া নেবে এলো। স্থানীয় অধিবাসীরা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। তারা ভাবলো, সদা সতর্ক সামরিক অফিসাররাই যখন তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তখন সাধারণ নাগরিকদের আর রক্ষা নেই। নেই কোনো সঠিক নিরাপত্তা। সন্ধ্যার পূর্বেই বাইরের কাজ মিটিয়ে ঘরের দরজা বন্দ করে দিলো সকলে।

মনে হলো সরকারও দস্তর মত ভয় পেয়ে গেছে। তারাও সন্ত্রাসকে আরও বর্ধিত করার জন্য দেড় হাজার গ্রামে সান্ধ্য আইন জারি করলো। অনেক শহরে তো আগেই রাত্রের জন্য কারফিউ জারি করা হয়েছিল।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীমশায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে বললেন, — পাকিস্তান যদি কাশ্মীরে তাদের অনুপ্রবেশকারীদের গেরিলা যুদ্ধ বন্ধ না করায় তবে আমরা তার জবাব দেবো পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে। আমরাও আমাদের বাহিনীকে প্রবেশ করিয়ে দেবো তাদের দখলকৃত এলাকায়।

নিউইয়র্ক টাইমস এর একজন রিপোর্টার সাক্ষাৎ করলেন প্রধান মন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সাথে। তিনি বললেন, আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন আমাদের স্থির বিশ্বাস যে কাশ্মীরবাসী আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেনি। তারা পূর্ণ শান্তিতে এখানে বসবাস করছে। পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীরাই করছে সব নষ্টামী। তারাই দিনের পর দিন অভূতপূর্ব ক্ষতিসাধন করছে আমাদের। আমরা আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারি না। বর্তমানে আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি যা আগে কখনও হয়নি। পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ আমাদের অবসম্ভাবী হয়ে পড়েছে। যুদ্ধকে পরিহার করা সম্ভব নয়।

সাংবাদিকটি পাল্টা প্রশ্ন করলেন প্রধান মন্ত্রী শাস্ত্রীর কাছে,—পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট তো এর বিপরীত কথা বলেছেন। তিনি যুদ্ধের বিলাসিতা পরিহার করার জন্য আপনাদের কাছে বারবার অনুরোধ করেছেন।

—কিন্তু আমরা দেখছি যুদ্ধ ছাড়া বিকল্প পথ নেই।

জি. এম, সাদিক শ্রীনগর শহরের নেতৃস্থানীর ব্যক্তিদের এক সমাবেশে ঘোষণা করলেন: যারা অনুপ্রবেশকারীদের প্রতি সমর্থন দান করবে তাদের আমরা কঠোরভাবে দমন করবো। নির্দয়ভাবে তাদের শাস্তি প্রদান করা হবে।

সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার মনে হলো, যুদ্ধ অবসম্ভাবী। পাকিস্তান সরকার ইচ্ছা করেও আর তাকে অবহেলা করতে পারবেন না। পারবেন না অস্বীকার করতে।

আমার অনুমানের সত্যতা উপলব্ধি করলাম পরদিনই। ভারতীয় বাহিনী গুজরাট জেলায় অনুপবেশ করে মর্টারের সাহায্যে বেদম গুলী চালাতে আরম্ভ করলো। সে গুলীর আঘাতে বিশজন পাকিস্তানী গ্রামবাসী নিহত ও ১৫ জনের মতো আহত হলো। পাকিস্তান সরকার জাতি সংঘের তদন্তকারী দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ও ভারত সরকারের কাছে একটা কড়া প্রতিবাদ প্রেরণ করা ব্যতীত আর কিছুই করলেন না।

কিন্তু ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মিঃ চৌহান লোকসভায় এক প্রশ্নের জবাবে বলেন,— আমাদের বাহিনী যখনই প্রয়োজনবোধ করবে তখনই যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লংঘন করে পাক কাশ্মীরে প্রবেশ করবে।

এদিকে সংবাদ পাওয়া গেল যে, মুক্তি সেনারা ২২শে তারিখের সংঘর্ষে ১২২ জন ভারতীয় সৈনিককে বিভিন্ন স্থানে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকজন সিনিয়র সামরিক অফিসারও নিহত হয়েছেন তাদের হাতে। সারাদিন ধরে সংঘর্ষ চলেছে বারামূলা, রাজুইরি, মেন্ধার, মালদি ও পুনচ্ অঞ্চলে।

মাসুদের কোনো সংবাদ পেলাম না আমি। প্রতাপের মাধ্যমে তাই একটা চিঠি পাঠালাম আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে। দুদিনেই জবাব চলে এলো। তাতে বলা হলো : মাসুদকে বদলী করা হয়েছে উরী সেক্টরে। সেখান থেকে আজাদ কাশ্মীর আক্রমণ করার আদেশ প্রদান করা হবে তাদের ট্রুপের। মাসুদও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে। তখন সে কী করবে এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। আমাদের কার্য অপ্রতিহত গতিতে চলেছে। কাশ্মীরকে উদ্ধার না করা পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হবো না। আপনার ঘাবড়ানর কোনো কারণ নেই। মাসুদের সাথে পুনর্মিলন আপনার হবেই।'

গোপন পত্র পেয়ে কিছুটা অশ্বস্ত হলেও মাসুদের জন্য মনটা আমার ভয়ানক উতলা হয়ে পড়লো। নানা দুশ্চিতা মাথার ভিতর ঘুরপাক খেতে লাগলো। কিন্তু চিন্তা করে কোনো লাভ ছিল না। কি বা করতে পারতাম তখন আমি ?

যুদ্ধ অবসম্ভাবী হয়ে পড়লো। চারিদিকের সেতু নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ভারতীয় বাহিনী হেলিকপ্টর যোগে সৈন্য প্রেরণ করলো বিভিন্ন বর্ডারে।

২৫ তারিখে ভারতীয় বাহিনী সাজোয়া বাহিনীর সহযোগে পাক কাশ্মীরের তিথওয়াল সেক্টরের দুটো বিচ্ছিন্ন ঘাটির উপর অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানের স্বল্প সংখ্যক প্রহরীকে সহজে পরাস্থ করে দখল করে নিতে সক্ষম হয়েছে বলে খবর পেলাম।

পরদিন সকালে হাসপাতালে যেতেই ডাক্তার দুলারাম আমাকে ডাকালেন তার অফিস রুমে। একটা কাগজ দেখিয়ে বললেন, দেভা ও ছাম্ব সেক্টরে গতকাল পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীর ব্যাপক গুলীবিনিময় হয়েছে। অসংখ্য ভারতীয় সৈন্য হতাহত হয়েছে সেখানে। সরকার বাধ্য হয়ে ছাম্ব সেক্টরে একটা 'এডভান্স ড্রেসিং স্টেশন খুলেছেন। কিন্তু এখনও কোনো ডাক্তার যায় নাই সেখানে। আপনাকে ড্রেসিং স্টেশনে যাওয়ার জন্য এক জরুরী আদেশ এসেছে।

—আমি মহিলা ডাক্তার। আমাকে কেন সেখানে? রাগতঃস্বরে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

- সে কথা আমাকে বলে কোনো লাভ নেই। অভিমান করেও কোনো ফয়দা হবে না। গাড়ী পাঠিয়েছেন সে সেক্টরের কমাণ্ডার। প্রস্তুত হয়ে নিন। অপারেশনের কিছু কিছু সরঞ্জাম এবং অতি প্রয়োজনীয় ওষুধ পত্র সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করুন। আর আপনার চাকর প্রতাপকে সাথে নিন।

—আপনি তো উপদেশ দিয়েই মুক্ত। কিন্তু এডভান্স ড্রেসিং স্টেশন মানে তো আপনি নিশ্চয় বোঝেন। সেখানে যাওয়ার অর্থ জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে দেহ ঢুকিয়ে দেওয়া, তা জানেন?

ডাক্তার দুলারাম হাসতে হাসতে বললেন, জানি না কেন? কিন্তু উপায় কি বলুন? আমার উপর আদেশ জারি হলে আমাকেও তো যেতে হতো? আমি মরলে স্ত্রী বিধবা হতো, ছেলেমেয়েরা পিতৃহারা

হতো বলেই বুঝি সরকার আমাকে রেহাই দিয়েছেন। আপনার তো আর কাঁদার কেউ নেই?

—নেই কেন? মা বাপ কি কেউ নয়? অবশ্য সরকারী আদেশ পালনে যাবোই আমি। ভয় করে লাভ তো কিছু হবে না?

—এ জন্যই তো সরকার আপনাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন।

অযথা কথা না বাড়িয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র হাসপাতাল থেকে নিয়ে চলে এলাম বাসায়। প্রতাপকে সব কথা বলায় সে বরং খুশী হলো। বললো,—খোদা যা করে মঙ্গলের জন্য। এখানে বসে আমাদের করণীয় বেশী কিছু ছিল না। খোদা তাই বুঝি খুশী হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করেছেন। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করতে পারলে মিলিটারী অফিসারদের নিকট থেকে নিশ্চয় গোপন কথা জানতে পারবেন আপনি। নিকটেই আমাদের গোপন আস্তানা রয়েছে। সংবাদ পরিবেশন করা ও প্রয়োজন মোতাবেক আঘাত করা সহজতর হবে।

—হয় তো হবে। বললাম আমি।

—হয় তো নয় দেখবেন সিওর হবে।

প্রতিবেশীদের নিকট থেকে বিদায় নিয়েই যাত্রা করতে হলো আমাদের। কারণ এডভান্স ড্রেসিং স্টেশনে যাওয়া মানে মরণের সাথে পাঞ্জাখেলায় অবতীর্ণ হওয়া। আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করতে গিয়ে বোমা কিংবা শত্রুপক্ষের নিক্ষেপিত শেলের আঘাতে মৃত্যু বরণ করা অস্বাভাবিক কিছু নয়। সৈনিকদের ন্যায় আগুন নিয়ে লেখতে হয় সেখানে চব্বিশ ঘন্টা। শত্রুপক্ষ যদি এগিয়ে আসে। যদি জয়ী হয় তবে বন্দী হওয়াও বিচিত্র নয়। তারপরের দুর্ভোগ অচিন্ত্যনীয়।

মিলিটারী গাড়ীখানা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলো যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে আমাদের বুকে নিয়ে। আশা নিরাশার দ্বন্দে বুকটা আমার কাঁপতে লাগলো।

কামানের আওয়াজ শ্রুতিগোচর হতে লাগলো। যতো এগিয়ে চললো আমাদের গাড়ী ততো স্পষ্টতর হতে লাগলো গোলাগুলীর আওয়াজ। স্বচক্ষে রণাঙ্গন কখনও দেখিনি। ভয়ে বুকটা দুরু দুরু করে কাঁপতে লাগলো তাই। মানুষের কথাই তখন আমার বেশীকরে মনে হতে লাগলো। কোথায় আছে সে এখন খোদাই জানে। ড্রেসিং স্টেশনে গিয়ে তাকে আহত দেখবো কিনা তাই বা কে জানে।

হঠাৎ একটা শেল ফাটার বিকট শব্দে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো। সামান্যের জন্য গাড়ীটা আমাদের বেঁচে গেল। ড্রাইভার মৃদুহাস্যে বললো, শত্রুর গোলা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। ভয় পাবেন না, ডাক্তার সাহেব।

ভয় পেলাম কিনা জানি না তবে ড্রাইভারের রসিকতায় যোগদান করতে পারলাম না। কোনো জবাব দিলাম না।

একটা বিরাট টিনসেডের সম্মুখে এসে গাড়ী থামালো ড্রাইভার। একজন সামরিক অফিসার বাইরে এসে আমাকে শুভেচ্ছা জানালেন। বললেন,—আপনার আগমন অপেক্ষায় আমরা এতোক্ষণ পথ চেয়ে ছিলাম।

—ধন্যবাদ। ছোট্ট জবাব দিলাম আমি।

বেশী কথা বলার ক্ষমতা ছিল না তখন আমার।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে আমার চক্ষু ছানাবড়া হলো। কয়েকটি মৃতদেহ ঢেকে রাখা হয়েছে সিক্ত মেঝের উপর। তার পাশে বসে কয়েক-জন সৈনিক বেশ আরামে সিগারেট ফুকছে। নারী আমি। ডাক্তার হলেও এতোবড় পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মনটা ছ্যাৎ করে উঠলো তাই।

মিলিটারী অফিসারটি বললেন,—বিস্তর কাজ রয়েছে আপনার। একবার আরম্ভ করলে আর বিশ্রাম করার সময় পাবেন না। আসুন এককাপ চা খেয়েনি।

—না, তার প্রয়োজন হবে না এখন। অসহনীয় যন্ত্রণায় রোগীর চিৎকার করছে। ওদের আগে এক নজর দেখে আসি।

অফিসারটি কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় এক ট্রাক নতুন আহত সৈনিককে আমদানি করা হলো সেখানে। ঘর ভর্তি হয়ে গেল আহত রোগীতে। সবাই সামরিক বিভাগের জোয়ান।

কোনো রকমে তাদের শোয়ার ব্যস্থা করা হলো। সেটাকে সত্যিকার অর্থে ব্যবস্থা না বলে অব্যবস্থাই বলতে হয়। যাকে যে অবস্থায় সম্ভব ফেলে রাখা হলো। কয়েকজনকে 'এমপুটেশন' করতে হবে বলে মনে হলো আমার। অপারেশন চালাতে হবে অনেকের দেহে।

দেহের অস্বাভাবিক যন্ত্রণায় সবাই ছটফট করছে। একজন চিৎকার করে বললো,—মরফিয়া চাই, মরফিয়া দিন আমাকে ডাক্তার সাহেব।

দয়া হলো লোকটার জন্য। মরফিয়া দেবার জন্য উদ্যোগী হতেই চতুর্দিক থেকে একই সঙ্গে চিৎকার ধ্বনিত হলো,—মরফিয়া চাই, মরফিয়া। আমাকে আগে দিন। আর সহ্য করতে পারি না!

পার্শ্বের অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম,—মরফিয়া কী পরিমাণে আছে? সবাইকে দেওয়া যাবে তো?

অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি আমাকে বললেন,—কোথায় পাবো এতো মরফিয়া? সবাইকে দিতে গেলে তো এক ট্যাঙ্ক মরফিয়ার প্রয়োজন।

হতাশ হলাম আমি অফিসারটির কথা শুনে। ওদিকে রোগীরা তো সমস্বরে 'মরফিয়া মরফিয়া' করে চিৎকার করেই যাচ্ছে। সত্যিই তখন মরফিয়ার একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উপায় কি?

আমার অবস্থা দেখে অফিসার একজন নার্সকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন অন্যত্র। অত্যল্প সময়ের মধ্যে নিয়ে এলেন একটা বোতল, তার গায়ে লেখা দেখলাম 'মরফিয়া'। বুঝলাম, স্টকে এখনও কিছু রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম ভদ্রলোকের ব্যবহার দেখে। আমি ডাক্তার, রোগীরা আমার কাছেই মরফিয়া চাচ্ছে অথচ তিনি নার্সের সাহায্যে একটি হাইপো ডারমিক সিরিঞ্জ দিয়ে প্রত্যেকের দেহে ইনজেকশন দেওয়াচ্ছেন। মুখ ফুটে কিছু বললাম না। রোগীদের চুপ করতে দেখে বরং কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। ভাবলাম যেভাবেই হোক, যার দ্বারাই হোক রোগীদের

উপকার হলেই হলো। তবু আমি ভদ্রলোকের নিকটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—কি ইনজেকশন দেওয়া হলো?

তিনি মৃদুহাস্যে বললেন,—ডিসটিল্ড ওয়াটার।

গা শিউরে উঠলো আমার। বলে কি? জিজ্ঞেস করলাম, —তার মানে? বোতলের গায়ে লেখা দেখলাম যে মরফিয়া?

আবার হাসলেন তিনি। বললেন,—এ ছাড়া আর কী উপায় ছিল, বলুন? ড্রেসিং স্টেশনে দেহের সাথে সাথে মানসিক ট্রিটমেন্টও মাঝে মাঝে করতে হয়। প্রয়োজন মতো ওষুধ সরঞ্জাম ব্যাণ্ডেজ কি পাবেন এখানে? এটা কি হাসপাতাল?

সারা রাত ধরে কাজ করলাম সেদিন। খাবার সময়ও পেলাম না। প্রতাপও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করলো। কয়েক ঘণ্টা ধরে তো শুধু অপারেশনই চালাতে হলো। কয়েকটা কেসে এমপুটেশনও করতে হলো। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ছিল না বললেই চলে। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলো আমাকে অনেক ক্ষেত্রে। সে এক অমানুষিক কারবার।

ওদিকে যুদ্ধ চলছিল তখনও। তখনও গোলাগুলীর আওয়াজ ভেসে আসছিল কানে। মনে হচ্ছিল, গোলার আঘাতে কখন আমাদের ড্রেসিং স্টেশনটি উড়িয়ে নিয়ে যাবে, কে জানে।

সকালে শুনলাম,—বেদর সেক্টরে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে আক্রমণ ধারা রচনা করেছিল। পাকিস্তান বাহিনীও তৈরী হয়ে ছিল। তারাও পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে অগণিত ভারতীয় সৈন্যকে হতাহত করেছে। পাকিস্তানেরও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে প্রচুর।

উরি অঞ্চলেও নাকি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সেখানে ভারতীয় বাহিনী একটা পাকিস্তানী পোস্ট অধিকার করতে সক্ষম হয়েছে।

তবে প্রতিশোধ নিয়েছে আমাদের মুক্তি সেনারা। তারা পুনচ এলাকায় অকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে দুটো ভারতীয় কোম্পানী ও বেটালিয়ন-হেড কোয়ার্টার ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে।

সে দিনটি অতিবাহিত হলো কোনো প্রকারে। ৩০ তারিখে শুনলাম, মুক্তি সেনারা একযোগে উরি, নওশেরা, মেনদার প্রভৃতি সেক্টরে আঘাত হেনে নব্বই জন ভারতীয় সেনাকে নিহত করেছে। চারজন অফিসারকেও হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে। ঐ সব অঞ্চল থেকে সন্ধ্যার দিকে ৪০ জন আহত সৈনিককে ট্রাক ভর্তি করে আমাদের ড্রেসিং স্টেশনে নিয়ে আসা হলো। তাদের অবস্থা আরও মারাত্মক মনে হলো। আমাদের সংস্থার লোকেরা যাদের আহত করেছে আমি অমানুষিক পরিশ্রমে তাদের সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণে।

অবশ্য স্পাই মীরার মৃত্যু হলো তখন—ডাক্তার মীরাই কাজ করে গেল সারাক্ষণ। মানসিক সংঘাত অপারেশন টেবিলে সম্ভব নয়।

৩১শে আগষ্টে হাজিপীরবাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হলো। এই দিন ভারত সরকার কয়েক বেটালিয়ন সৈন্য ঠেলে দিলো পাকিস্তানের অভ্যন্তরে। ভয়াবহ যুদ্ধ চললো সারাদিন ধরে। রাত আটটা পর্যন্ত গোলা-গুলীর আওয়াজ শোনা গেল।

এই সময় আরও সামরিক বাহিনী সীমান্তে প্রেরণ করার জন্য আদেশ প্রদান করা হলো হেড কোয়ার্টারে। একজন মেজর আমাদের সেন্টারে আগমন ক'রে আমার সহযোগী অফিসারটির কাছে সে সংবাদ প্রদান করলেন। বললেন,—আজ রাত্রেই যদি নতুন সৈন্য সেখানে পৌঁছতে না পারে তবে পাকিস্তানী বাহিনীকে প্রতিহত করা সম্ভব হবে না। ড্রেসিং সেন্টারও বিপন্ন হবে। ভোর রাতের মধ্যেই আপনাদের আরও অভ্যন্তরে সরে যেতে হবে।

সংবাদটা শুনে প্রথমে আমি খুব ঘাবড়ে গেলাম। পর মুহূর্তে একটা নতুন দুষ্টবুদ্ধি মাথায় চাপলো। উপযাচক হয়ে মেজর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম,—কয়টার মধ্যে পৌঁছবে আমাদের নতুন বাহিনী?

—রাত তিনটার মধ্যে পৌঁছে যাবার কথা।

—কোন পথে আসবে? আবার প্রশ্ন করলাম আমি।

—রাজুরী-বাধল রোড দিয়েই আসবে।

পরিষ্কার জবাব পেয়ে গেলাম আমি। কর্তব্য স্থির করে ফেললাম। এক ফাঁকে চলে গেলাম আমার কক্ষে। দরজা বন্ধ করে সংবাদটা লিখে ফেললাম কোড ল্যাংগুয়েজে। তার পর প্রতাপকে ঈশারায় আহবান করলাম সেখানে। অল্প কথায় বুঝিয়ে বললাম তাকে সব।

নাইট পাশ ছিল তার কাছে। আমার জন্য কিছু ফল ও নরম পাউরুটি আনার নাম করে প্রেরণ করলাম তাকে আসল ঘাটির উদ্দেশ্যে। কাল বিলম্ব না করে প্রতাপ যাত্রা করলো তার ঝাঁকড়া চুলের মধ্যে আমার লিখিত জরুরী খবরটা নিয়ে। ভয় বলে কোনো জিনিস ছিল না তার প্রাণে।

পাঠালাম তো তাকে, কিন্তু ঘুম হলো না আমার তার প্রত্যাবর্তনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। আগুন নিয়ে খেলছি অনেকদিন থেকে কিন্তু এদিনের মতো এমন গনগনে আগুন নিয়ে আর কোনোদিন খেলিনি। এখানে মোড়ে মোড়ে মিলিটারী, আডডায় আডডায় প্রহরী। সদা সতর্ক তারা। তাদের চোখে প্রতাপ ধূলো দিতে ব্যর্থ হলে, নিশ্চিত ভাবে সাঙ্গ হবে আমার জীবন লীলা, ব্যর্থ হবে মুক্তি সংগ্রামীদের আন্ডার গ্রাউণ্ড কার্যপদ্ধতি। সমূলে উৎপাটিত হবে তাদের সকল পরিকল্পনা।

খোদার অসীম মেহেরবানীতে প্রতাপ প্রত্যাবর্তন করলো নির্ঝঞ্ঝাটে নিরাপদে। পৌঁছে দিয়ে আসতে সক্ষম হলো আমার ছোট্ট কাগজখানি যথাস্থানে।

পরদিন গোপন সংবাদে জানতে পারলাম যে, একটা বড় কনভয় ধ্বংস করে দিয়েছে মুক্তি সেনারা রাজুরি-বাদল রোডে। রাত্রের অন্ধকারে মাত্র কয়েকজন মোজাহিদ অসংখ্য বোমা নিয়ে অপেক্ষা করছিল ভারতীয় বাহিনীর গতি পথের ধারে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে। আগেই মাইন স্থাপন করে রেখেছিল সেখানে।

মুক্তি সেনাদের এই অভাবিত কৃতকার্যতা আমাকে যে কতোখানি আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছিল তা এখন আপনাদের বুঝিয়ে বলতে পারবো না। আপনারাও সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন না।

তবে যখন সে আঘাতে জখমগ্রস্ত রোগীদের ট্রাক ভর্তি করে আমাদের ড্রেসিং ষ্টেশনে নিয়ে আসা হলো, তাদের করুণ আর্তনাদ ও বাঁচার আকুল আবেদন তখন আমার সেবাপরায়ণ নারী হৃদয়কে ব্যথিত করে তুললো। সারা দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের কিছুটা আশ্বস্ত করতে পারলাম। তাদের মনে জীবন ফিরে পাওয়ার আশার সঞ্চার করতে সক্ষম হলাম।

যে স্পাই-হাতের লেখা সংবাদ পেয়ে মুক্তি সেনারা তাদের উপর অকস্মাৎ আঘাত হেনে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছে সেই হাতের কোমল স্পর্শে আহতরা আবার সুস্থ হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

নিজের দুমুখো নীতির প্রতি নিজেরই অশ্রদ্ধা জন্মাতে লাগলো। ভাবলাম, আমার কাজ কি ঠিক হচ্ছে? আমি কি সঠিক পথে চলছি? কতদিন চলবে এমন দুই বিপরীত চরিত্রে আমার অভিনয়? এর শেষ কোথায়? পরিণামই বা কী?

একটু অন্য মনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—কী মিস মীরা। গোমড়া মুখো হয়ে বসে রইলেন কেন?

চিন্তার সূত্র ছিন্ন হলো সামরিক অফিসারটির সহাস্য প্রশ্নে। একটু অপ্রস্তুত হলাম যেন। বললাম,—না, গোমড়া মুখো নয়। ভাবছি, কাদের দোষে আমাদের দেশে এই ভয়াবহ অশান্তি নেমে এলো? কার পাপের প্রায়চিত্ত করার জন্য যুদ্ধের অভিশাপে নিপতিত হলো শান্তিপ্রিয় কাশ্মীরবাসী। এরজন্য দায়ী কে?

—আপনি তো দিদি সাংঘাতিক লোক? এতো গভীরে যায় আপনার চিন্তা? বললেন একজন বৃদ্ধ কম্পাউণ্ডার।

—না ভাই, বেশী কিছু চিন্তা করতে পারি না, চিন্তা করি নিজের জন্য, চিন্তা করি আত্মীয়স্বজনের জন্য।

—সে ভয় তো প্রত্যেকেরই আছে। আমরা আছি তো আবার ভয়ঙ্কর জায়গায়। এখানকার ডাক্তার ও নার্সরা সব সামরিক বিভাগের কর্মচারী, বন্দীদেরও চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় এখানে। মুক্তি

সেনাদের তাই রাগ থাকতে পারে আমাদের উপর। ভাবী, কখন তারা গুপ্ত আক্রমণ চালায় এখানে।

সমর্থন জানালাম তার মন্তব্যের। ডিউটি শেষ হয়েছিল আমার। বিদায় নিয়ে বিষন্ন বদনে চলে এলাম তাই নিজ আস্তানায়।

প্রতাপ তখনও জেগে ছিল। আনন্দে লাফাতে লাগলো সে। বললো,

— সদা-এ-কাশ্মীর রেডিওর শেষ খবর শুনেছেন?

—না। ড্রেসিং সেন্টারে বসে কি গোপন খবর শোনার উপায় আছে? অন্যেরা সন্দেহ করে না তা হলে?

— তা ঠিক। বললো ছদ্মবেশী প্রতাপ।

—কেন? আশাপ্রদ কোনো সংবাদ আছে নাকি?

— আছে মানে? সংবাদ শুনে মনে হলো সারা পৃথিবী আমাদের সমর্থনে। জাতিসংঘের জেনারেল সেক্রেটারীর শান্তি প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন আমেরিকার স্টেট সেক্রেটারী। তিনি তাঁর ওয়াসিংটনস্থ অফিসে ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতদের আহ্বান করে বলে দিয়েছেন সে কথা।

'বি-বি-সি'-র ভাষ্যকার, বলেছেন,—'যেদিন ভারত সরকার অধিকৃত কাশ্মীরকে তাদের শাসনতন্ত্রের আওতাভুক্ত করেছে সেদিন থেকেই কাশ্মীরবাসী বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তারা সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। ভারত সরকার যদি তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সময় থাকতে স্বীকার করে নিতো, যদি তাদের প্রতি অন্যায় ভাবে ভারতীয় শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দিতে না চাইত তবে কাশ্মীরবাসী এই আত্মঘাতী সংগ্রামে কখনও ঝাঁপিয়ে পড়তো না।'

শুধু তাই নয়। রিচার্ড ক্রিচফিল্ড ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টারে একটা প্রবন্ধে বলেছেনঃ 'গত তিন সপ্তাহ যাবৎ কাশ্মীরে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম হয়েছে। সৈন্যবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারে নিরীহ গ্রামবাসী দলে দলে পাহাড়ের গুহায় কিংবা গভীর জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। শুধু গত সপ্তাহেই কয়েক হাজার বাড়ীঘর ভস্মিভূত

হয়েছে। সমগ্র উপত্যকায় পঞ্চাশ থেকে সত্তরটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন তারা। শুধু শ্রীনগর শহরেই ৪৪০টি পাকা বাড়ী ধূলিসাৎ করেছে। হত্যা, রাহাজানি আর নারীধর্ষণের যে চিত্র প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রেরণ করেছে তা বর্তমান সভ্য জগতে অচিন্ত্যনীয়। ভারত সরকার অবশ্য পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের উপর দোষ চাপিয়েছেন।

তারা বলেছেন,—পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীরাই করেছে এই নারকীয় যজ্ঞ।'

প্রতাপের লম্বা চওড়া বক্তৃতা শেষ হতেই আমি বললাম,—খোদা আমাদের সহায়, সারা পৃথিবী আমাদের পক্ষে, জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

—আমাদের অনেক কর্তব্য কিন্তু শেষ হয়নি। আজ সন্ধ্যায় আমাদের দলের একজন কর্মী এসেছিলো এখানে। একটা কাগজ রেখে গেছে। আর রেখে গেছে কয়েকটা ডিনামাইট স্টিক ও কয়েক গজ কয়েল। প্রয়োজন মতো কাজে লাগাতে হবে সেগুলি।

পোশাক পরিবর্তনের পূর্বেই কাগজখানা হাতে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম। তাতে লেখা ছিল: শুভদিন আগত। আগামী দু এক দিনের মধ্যে চরম আঘাত হানা হবে। তখন তাদের একমাত্র পথ হবে আপনাদের ড্রেসিং সেন্টারের পশ্চিম পার্শ্বের সেতুটা। ওর সন্নিকটে কোনো বসতি না থাকায় সময়কালে সেতুটি ধ্বংস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। শেষ আঘাতের চার পাঁচ ঘণ্টা পূর্বে করাও উচিত হবে না। কারণ তা হলে তারা হয় সেটাকে মেরামত করে নেবে, নয় বিকল্প পথ বানিয়ে নেবে। আমরা সে সুযোগ দিতে চাই না। তাই যখনই যুদ্ধ বেধে যাবে তখনই প্রতাপকে প্রেরণ করতে হবে সে দায়িত্বপূর্ণ কার্য সমাপণ করতে। অন্যথায় তাদের জব্দ করা সম্ভব হবে না।

প্রতাপকে বুঝিয়ে বললাম ব্যাপারটা। সে বললো,—আমি জানি। সব প্লানের কথা আমাকে শুনিয়ে গেছে লোকটা।

—থাক, আর বলতে হবে না। কে কোথায় কান পেতে রয়েছে খোদা জানে। তুমি সাবধানে স্টিকগুলো রেখে দাও। সময় হলেই আমি তোমাকে বলে দেবো। আগে থেকে স্থানটা দেখে আসবে ভাল করে।—বাধা দিয়ে বললাম প্রতাপকে।

পরদিন ২রা সেপ্টেম্বর। সকাল ছয়টা থেকে ডিউটি ছিল আমার। সাত সকালে গেলাম ড্রেসিং সেন্টারে। কিন্তু গিয়েই শুনলাম: চাম্ব সেক্টরে পাকিস্তান বাহিনী যুদ্ধ আরম্ভ করেছে। দ্রুততর গতিতে এগিয়ে আসছে এদিকে। একই সঙ্গে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কুশলী পাইলটরা ছাতার ন্যায় তাদের সেনাদলের মাথার উপরে আকাশ পথের পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আহার্যের সন্ধানে যে ভিখারীটি আমার দরজায় এলো তার কাছে আর একটা অচিন্ত্যনীয় খবর পেয়ে ভয়ানক মুষড়ে পরলাম। ভিখারীর ছদ্মবেশে খাদ্যের সন্ধানে এলেও আসলে সে ছিল আমাদের দলের একজন সক্রীয় কর্মী। সে একটা চিরকুট দিয়েই দ্রুত চলে গেল। মিলিটারীদের মধ্যে অধিক্ষণ অবস্থান করা আদৌ নিরাপদ ছিল না। ছিল না যেমন তার জন্য, তেমনি আমার জন্যও।

তার প্রত্যাবর্তনের পর কাগজখানা খুলে দেখলাম: 'আঘাত পাবেন জেনেও খবরটা আপনাকে না দিয়ে পারছি না। আজ সকালে পাকিস্তানী বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সময় আরও তিনজন অফিসার সহ মাসুদ বন্দী হয়েছে। ১২ জন শিখ সৈনিকও সে দলে ছিল।'

সংবাদটা পেয়ে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাকে কেন্দ্র করে আমার জীবন। যার প্রদত্ত কর্তব্য পালন করার জন্যই আজ আমি স্পাই। আগুন নিয়ে খেলা করতেও ভয় পাই না সেই ব্যক্তিটির বন্দী হওয়ার খবর আমার হৃদয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি না করে পারলো না। যুদ্ধরত সেনাপতিকে বন্দী করার অর্থ যে কি তা আমার ভালো করেই জানা ছিল। চারজন পাকিস্তানী সৈনিককে নিয়ে এরা কি টানা হেঁচড়া করেছে সে তো নিজের চোখেই দেখেছি। পাকিস্তানীরা তো পেয়েছে অফিসারদের।

মনে নানা জাতীয় প্রশ্ন জাগতে লাগলো। মনে হলো, মাসুদের মুক্তি বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কথা কি তারা বিশ্বাস করবে না? মাসুদ কি সেকথা তাদেরকে বলবে না? তা'রা কি প্রমাণ চাইবে? কি বা প্রমাণ দেওয়ার আছে তার? কিন্তু আপন জীবনের ঝুকি নিয়ে এতো যে করলো তার কোনো মর্যাদা কি পাকিস্তান বাহিনী দেবে না? না দিলে তখন কি হবে তার?

মনটা এমনিতেই ভালো ছিল না। সকাল থেকে কেমন যেন মন মরা মনে হচ্ছিল। তবু ভাবলাম, মাসুদ নিশ্চয় বিনা কারণে আত্মসমর্পণ করেনি। অক্ষত অবস্থায় যখন বন্দী হয়েছে তখন তার মনে নিশ্চয় কোনো দুরভিসন্ধি রয়েছে। শিখ সৈনিকদের সম্বন্ধেও অনেক কানাঘুষা শুনলাম। অনেকে বললো,—শিখ সৈনিকরা পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করতে রাজী হচ্ছে না।

তাদের ধারণা, ভারত সরকার ইচ্ছা করেই তাদের সীমান্ত প্রেরণ করে সাজা দেওয়ার চেষ্টা করছে। কারণ রাজনৈতিক কারণে পাঞ্জাবী শিখরা ভারত সরকারের উপর অসন্তুষ্ট। আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত সরকার শিখ নেতাদের উপর ভয়ানক চটা। শিখ সৈন্যদের বিশ্বাস, সে কারণেই ভারত সরকার পাকিস্তানীদের সাথে যুদ্ধ বাঁধিয়ে তাদের প্রেরণ করছে সীমান্ত ঘাঁটিগুলোতে। তাই তারাও জীবনের বিনিময়ে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত নয় বন্দী হবে পাকিস্তানীদের হাতে তবু প্রাণ দেবো না।

খোদা'র কাছে কায়মনবাক্যে বললাম, খোদা এ কথাই সত্য হোক। মাসুদও যেন সে দলের অন্তর্ভুক্ত হয়। অক্ষত অবস্থায় যেন তাদের হাতে ধরা পড়ে। তার কথা পাকিস্তানী বাহিনীর কমাণ্ডারগণ যেন বিশ্বাস করে তাকে শাস্তি না দেয়।

মন আমার বললো,—তোমার অনুমানই ঠিক। মাসুদ তাই করেছে।

রোগীদের নিয়ে ব্যস্ত আছি। কয়েক ডজন নতুন আহত সৈনিক আবার এসেছে সেখানে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে সীমান্তে। সংবাদ পেলাম আহত সৈনিকদের কাছে। ভয় ভাবনা তখন বেশী প্রতি

ক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারছে না অন্তরে। ডাক্তারী বিদ্যার পারদর্শিতা প্রদর্শনেই অধিক মনোযোগী। আকস্মাৎ লক্ষ্য করলাম সর্বত্র একটা ব্যতি ব্যস্ত ভাব। একটা সন্ত্রাস আর ভীতি বিহবলতার বহিঃপ্রকাশ। সামরিক অফিসাররা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে পড়েছেন। কামানের গোলা আর বোমা ফাটার আওয়াজ নিকটবর্তী হচ্ছে।

—ব্যাপার কি ? জিজ্ঞেস করলাম অর্ধ ছুটন্ত সামরিক অফিসারটিকে। তিনি ব্যস্ততার সাথে বললেন,—যুদ্ধের গতি ভালো নয় সেতু পার হয়ে নিরাপদ স্থানে নতুন প্রতিরক্ষা ঘাটি তৈরীর আদেশ প্রেরিত হয়েছে হেড কোয়ার্টার থেকে। দ্রুততর গতিতে আমাদের সৈন্য বাহিনী পশ্চাদাপসারণ করছে তাই।

—আমাদেরও কি ওপারে যেতে হবে? জিজ্ঞেস করলাম আমি।

—হ্যা, আমাদেরও। কিন্তু আহত রোগীদের অবস্থা কি হবে জানি না।

ভয় পেয়ে যাবারই কথা। যুদ্ধকে কখনও স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি। তার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সামান্য ধারণা থাকলেও অভিজ্ঞতা নেই এতটুকু। ভয় তবু পেলাম না। মনে হলো নেতার আদেশের কথা। প্রয়োজন মতো সেতু উড়িয়ে দেবার কথা। অফিসারটি দূরে চলে যেতেই চলে এলাম তাই আমার কক্ষে। প্রতাপকে প্রেরণ করা দরকার মনে করলাম সেতু ধ্বংসের কাজে।

প্রতাপ তৈরী হয়েই ছিল। আর দু'মিনিট পরে গেলে আমার সাথে সাক্ষাৎ হতো না তার। শেষ সালাম জানিয়ে কর্তব্য সাধনে বহির্গত হলো সে যাবার বেলায় শুধু বললো,—এ জীবনে আর সাক্ষাৎ নাও হতে পারে। নিজের আগুনে পুড়ে মরতেও পারি। তবু আমার কর্তব্য আমি করে যাবো।

কান্নায় বুক ভেঙ্গে আসছিল আমার। মনে হচ্ছিল, এ কী করছি আমি। নিজ হাতে সাজিয়ে দিলাম তাকে মৃত্যুমুখে ?

কিন্তু কান্নার অবকাশ ছিল না। গোলার আওয়াজ নিকটতর হতে লাগলো। কয়েকটি মিলিটারী ট্রাককে আমাদের হাসপাতালের

পিছন দিয়ে সেতু অতিক্রম করতে দেখা গেল। রসদ বোঝাই মনে হলো সেগুলোকে। একটু পরেই এলো কয়েকখানা ট্যাঙ্ক। চলে গেল ঘড়ঘড় শব্দ করে হাসপাতালের পাশ দিয়ে। উৎকর্ণ হয়ে রইলাম তখন আমি। প্রতাপ কি করলো জানার আগ্রহ আমার সারা দেহ মনের।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলাম যেন, একটা রোগী আমাকে আহবান করেছিল। অকস্মাৎ একটা বিকট আওয়াজ সারা হাসপাতালটাকে কাঁপিয়ে তুললো। থর থর করে কাঁপতে লাগলাম আমরাও। মনে হলো, শুধু সেতুটি নয় সারা অঞ্চলটা প্রচণ্ড কাঁপনিতে ভেঙ্গে পড়েছে। বুঝলাম, প্রতাপ তার কর্তব্য সম্পন্ন করতে পেরেছে কিন্তু আমাদের উপায়? আমরা কি করে ওপারে যাবো? কি করে প্রাণ রক্ষা করবো। পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে হয় তো এখনই বন্দী হতে হবে। হয় তো বেইজ্জতিও।

চিন্তা করার ফুরসৎ পাওয়া গেল না। ভয় ভীতি আর সন্ত্রাস যেন সবাইকে পেয়ে বসেছে। ছুটাছুটি করছে সবাই দিক বিদিক।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলাম আমি। সৈন্য বাহিনীর গাড়ীগুলি ছুটাছুটি আরম্ভ করল। রোগীরাও খুড়িয়ে খুড়িয়ে পলানর চেষ্টা করতে লাগলো। ওদিকে গোলাগুলীর আওয়াজ স্পষ্টতর হলো। খুব নিকটে মনে হলো শত্রুপক্ষকে।

আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। প্রতাপের আত্মত্যাগ আর মানুদের বন্দী জীবনের কথাই বারবার আমার হৃদয়ে আঘাত করতে লাগলো। ছুটে গেলাম নিজ কক্ষে। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে থাকলাম। নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনা মনকে ছেয়ে ফেললো। বালিশের মধ্যে কতক্ষণ মুখ গুজে কাঁদছিলাম বলতে পারবো না। হঠাৎ দরজায় করাঘাত শুনতে পেলাম। মনে হলো, পাকিস্তানী বাহিনী দখল করে নিয়েছে সে অঞ্চল। আমাকে বন্দী করতে এসেছে। এখনই ধরে নিয়ে যাবে তাদের শিবিরে। হয়তো দেহের উপর চালাবে অমানুষিক অত্যাচার। পূর্বাহ্নে বিষ কাছে না রাখার জন্য রাগে চুল ছিড়তে

ইচ্ছা হলো। গলায় দড়ি লাগিয়ে আত্মহত্যা করার জন্য অগ্রসর হলাম।

ওদিকে দরজায় অধৈর্য আগন্তুকদের করাঘাত থেকে পদাঘাত হতে লাগলো। মরতে গিয়েও মরতে পারলাম না। অশিষ্ট সৈনিকদের পদাঘাতে দুর্বল দরজা ভেঙ্গে গেল। ভিতরে প্রবেশ করলো দুজন কমাণ্ডার। কিন্তু মুখ তুলে চাইতেই আমি অবাক হয়ে গেলাম। কই তারা তো পাকিস্তানী কমাণ্ডার নয়! ভারতীয় বাহিনীর দুজন অভিজ্ঞ অফিসার। একজনকে আমি পূর্ব থেকেই চিনতাম। বললাম, —কী চান আপনারা? যুদ্ধের খবর কি?

আমার প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে একজন অফিসার কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,— আপনার চাকর প্রতাপ কোথায়?

বিস্ময়ের সাথে পাল্টা প্রশ্ন করলাম আমি,—কেন, তাকে পেয়েছেন নাকি আপনারা?

—বলুন না সে কোথায়? অসৌজন্যমূলক সে কণ্ঠস্বর।

—জানি না, দুপুর থেকে তাকে পাচ্ছিনা।

—আপনার ঘর আমরা সার্চ করবো। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না যেন। আপনি যে একজন স্পাই তার সব প্রমাণ আমরা পেয়েছি। আপনিই প্রতাপকে ডিনামাইট দিয়েছেন সেতু উড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

—আমি? আমি স্পাই? কার স্পাই?

—ন্যাকামি রাখুন। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন এখানে।

আমাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তারা স্যুটকেস- পেটরা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। রাগে গর গর করতে লাগলো অফিসার দুজন। দশ মিনিটে সব তছনছ করে দিলো একেবারে।

হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি সেখানে। মনে হলো, কিছুই পাবে না তারা। কিন্তু পর মুহূর্তেই মনে পড়লো গতকালকার পত্রখানার কথা। ভিখারীটি যে পত্রখানা দিয়েছিল—সে পত্রে মাসুদের

বন্দী হওয়ার খবর লিখিত ছিল। সেখানা তো ছেঁড়া কিংবা পোড়ানো হয়নি। একটা বইয়ের মধ্যেই রক্ষিত ছিল। মাসুদের খবর ছিল বলেই নষ্ট করেনি। বুকটা কেঁপে উঠলো। মনে পড়লো শরীফ ভাইয়ের কথা: মনে রাখবেন, ধরা যদি কখনও পড়েন তো যে নিজের জন্যই পড়বেন। সামান্য জিনিসকে অবহেলা করবেন না। চিঠিগুলি সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলবেন। ছাইটুকুও নষ্ট করবেন।'

আর চিন্তা করতে পারলাম না। এগিয়ে গেলাম অফিসার দুটির কাছে। বললাম,—কী খুঁজছেন আপনারা? আমি স্পাই হতে যাবো কোন দুঃখে? কার জন্য স্পাইগিরি করবো?

আমার কথা শেষ না হতেই একজন অফিসার বইটা খুলে কোড ল্যাংগুয়েজের কাগজখানা হাতে নিয়ে আমার দিকে তার রক্তজবা চোখদুটো তুলে ধরে জিজ্ঞেস করলো,—এটা কি?

দেখলাম, ওটা আমার মৃত্যুর পরোয়ানা।

কোনো কথা বলতে পারলাম না। নিজের বোকামির জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছা হলো।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে অল্প বয়স্ক অফিসারটি দাঁতে দাঁত চেপে বললো,—তোমাকে আমাদের সাথেই যেতে হবে। তুমি বন্দী। এখনই কোর্ট মার্শালে বিচার হবে তোমার।

প্রতিবাদ করে লাভ ছিল না।

কমাণ্ডারের কাছে নিতেই তিনি বললেন,—ওকে হাজতে পাঠিয়ে দাও। কাল বিচার হবে। এক মাইলের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। সেতু ধ্বংস হওয়ায় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য হেড কোয়ার্টার থেকে সংবাদ এসেছে। পাকিস্তান বাহিনীও সুবিধা করতে পারছে না। আমাদের বাহিনী যদি কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে তবে কাল সকালে ওর বিচার হবে।

একটা অন্ধকার নির্জন সেলে তারা রেখে গেল আমাকে।

নির্জন সেলে বসে বসে ভাবতে লাগলাম, মা-বাবার কথা। মাসুদের কথা। শরীফ ভাইয়ের কথা, সেই খোপা ছেলেটা ও প্রতাপের আত্মত্যাগের কথা, আমার জানালার কাছে গুলীর আঘাতে মৃত অজ্ঞাত মানুষটির কথা...আরও কতো হ-য-ব-র-ল চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কোর্ট মার্শালের কথাও মনে হলো।

মন প্রশ্ন করলো,—কিভাবে মারবে তারা আমাকে?

: গুলী করে।

: হাত ও চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেবে আমাকে?

: নিশ্চয়।

: আর কি করবে?

: রাইফেল উদ্যত সৈনিকদের প্রতি আদেশ প্রদান করবে কমাণ্ডার।

: কি আদেশ?

: ফায়ার।

আর ভাবতে পারিনে। মাথা ঘুরে পড়ে যাই মেঝেতে। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু পারি না।

সারা রাত ঘুম হয় না। ভেবে পাইনা ওরা আমাকে হঠাৎ সন্দেহ করলো কেন? প্রতাপ কি মরেনি? ধরা পড়েছে? অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সব কিছু কি বলে দিয়েছে? না, তার মৃতদেহ দেখে আমাকে সন্দেহ করেছে। সে আমার বাসার চাকর না হলে বুঝি আমাকে তারা সন্দেহ করতে পারতো না।

সারা রাত ধরে খোদার কাছে মোনাজাত করলাম: খোদা তুমি আমাকে রক্ষা করো। মাসুদ নিশ্চয় প্রাণে বেঁচে আছে। নিশ্চয় সে আমাকে নিয়ে সংসার করার স্বপ্ন দেখছে।

কিন্তু আমি তখন কোথায় থাকবো? মাসুদকে কি পাকিস্তান বাহিনী ক্ষমা করবে? তার কথা কি বিশ্বাস করবে? খোদা তুমি কি তোমার অলৌকিক শক্তির বলে আমাদের দুটো পবিত্র হৃদয়কে একত্র করতে পারো না?

ভোর রাত্রে নতুন করে গোলাগুলীর আওয়াজ কানে ভেসে এলো। দ্রুত নিকট থেকে নিকটতর হতে লাগলো সে শব্দ। অন্ধকার সেলের মধ্যে নিরিবিলি বসে কিছুই অনুমান করতে পারলাম না।

দুপুর হয়ে এলো। কিন্তু আমার ব্রেকফাষ্টও এলো না। ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লাম। কোর্ট মার্শাল তো দূরের কথা একটা প্রাণীও এলো না আমার খোঁজ খবর নিতে।

হঠাৎ দেখি, আমার সেন্ট্রটি চঞ্চল হয়ে পড়েছে। বাইরে ছুটা-ছুটি আর ভীতিবিহবল চেচামেচির আরম্ভ হয়ে গেছে। মিলিটারী ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে কড়া নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এমন বিকট চিৎ-কার আর হুড়োহুড়ি করতে ইতিপূর্বে দেখিনি কখনও।

প্রহরীটিও অদৃশ্য হলো। হুড়োহুড়ির শব্দও যেন স্তিমিত হয়ে গেল। গুলীর আওয়াজও আমার পশ্চাতে ধ্বনিত হতে লাগলো। কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম আমি।

আকস্যাৎ সামরিক বাহিনীর পোশাক পরিহিত কয়েকজন জোয়ানকে আমার ছোট্ট সেলের সম্মুখে আসতে দেখলাম। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম তারা দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। কিছু অনুধাবন করতে পার-লাম না। ভাবলাম এ আবার কোন নতুন বিপদ এলো। ক্ষিপ্ত সৈনি-করা নির্জনে আমার দেহের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাবে না তো। চিন্তা করতে পারলাম না আর। দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুজে বসে পড়লাম।

বিকট শব্দে দরজাটা ভেঙ্গে গেল। মুখ তুলে দেখলাম না। অনুমানে বুঝলাম। খোদার নাম শরণ করলাম।

কয়েকটি ভারী পায়ের শব্দ স্পষ্টতর হলো। নিকটতর হলো বলে অনুমান করলাম। থর থর করে কেঁপে উঠলো দেহ। মাসুদের কথা বার বার মনে হতে লাগলো। তার জন্য সযত্নে রক্ষিত পবিত্র দেহের যথেচ্ছা ব্যবহারের আশঙ্কা আমাকে হিম শীতল করে ফেললো। আর চিন্তা করতে পারলাম না। জড় বস্তুর মতো পড়ে রইলাম।

—ওঠো মীরা। আমরা বিজয়ী। চেয়ে দেখ তোমার সম্মুখে কে?

কানকে বিশ্বাস করতে পারলাম না যেন। বন্দী জীবনের এই নির্জন কক্ষে আমার প্রাণাধিক প্রিয় মাসুদের মিষ্টি কণ্ঠের সুমিষ্টি আহবানের কল্পনাও করতে পারিনি।

আনন্দে কাঁদতে ইচ্ছা হলো আমার। মাথাটা যেন পোঁ পোঁ করে ঘুরতে লাগলো। পিছন ফিরে মুখ তুলে চাইতে পারলাম না তার দিকে। নিশ্চল পাথরের মত ভারী হলো যেন আমার পা দুখানা।

—কি, উঠবে না? কথা বলবে না? রাগ করেছ?

আর চুপ বসে থাকা সম্ভব হলো না। কি যেন হলো আমার। পাগল হয়ে গেলাম একেবারে। অন্যের উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হলাম। মাসুদের শেষ প্রশ্ন 'রাগ করেছ' আমাকে উন্মাদিনী করে তুললো। দ্রুততম বেগে উঠে দু হাত জড়িয়ে ধরলাম তাকে। তৃপ্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলাম মাসুদের বুকে মুখ লুকিয়ে।

সমাপ্ত